মাসিক
আল-আবরার

الابرار

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

(প্রস্তুতিমূলক) The Monthly AL-ABRAR

ফেব্রুয়ারী ২০১২ইং, রবিউল আওয়াল ১৪৩৩হি: ربيع الاول ١٤٣٣ھ، فبرائر ٢٠١٢

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক :

ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান দা. বা.

প্রধান সম্পাদক:

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক:

রিজওয়ান জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক:

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

প্রচার সম্পাদক:

মাওলানা লোকমান

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি:

মুহাম্মদ হাশেম

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী জামাল উদ্দীন
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
মুফতী মাহমূদুল হক্ব
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী
মুফতী জা'ফর আলম কাসেমী

বিনিময়: ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সূচীপত্র

শুভ কামনা : ২
সায়্যিদ আব্দুল মজীদ নদীম
সম্পাদকীয়: ৩
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :..... ৪
পবিত্র সুন্নাহ থেকে : ৬
দরসে ফিক্বহ: ৭
মুফতী শাহেদ রহমানী
ফকীহুল মিল্লাত দা.বা. এর ইরশাদসমূহ:..... ৯
মাওলানা লোকমান
উম্মতের উপর অর্পিত মহানবী সা. এর হকসমূহ : ১২
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
মহানবী সা. এর জীবনাদর্শ : ১৬
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল মাদানী
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন:..... ১৮
শাহ আবরারুল হক্ব হারদূয়ী রহ. ২৭
মুফতী উমর ফারুক
পরিবেশ বিপর্যয়ের মূল কারণ:..... ২৯
মাওলানা কাজী ফজলুল করীম
দু'আ :..... ৩১
মুফতী আবু মাশহূদ
কোয়ান্টাম মেথড :..... ৩২
মুফতী শরীফুল আজম
নির্বাচিত ফতওয়া :..... ৩৭
মারকাযের খবরাখবর :..... ৪০

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর:
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত স্মরণী,
বসুন্ধরা, বাড্ডা, ঢাকা।
ফোন: ০২৮৪০২০৯১,০২৮৮৪৫১৩৮
মোবাইল:০১৮১৭০০৯৩৮৩, ০১১৯১২৭০১৪০
ই-মেইল: monthlyalabrar@gmail.com

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ খতীব, শায়খে তরীক্বত
আওলাদে রাসূল, হযরত মাওলানা
সায়্যিদ আব্দুল মজীদ নাদীম সাহেব পাকিস্তান দা. বা. এর

শুভ কামনা

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব দা. বা. এর তত্বাবধানে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরার প্রকাশনা সংস্থা ফক্বীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন কর্তৃক "আল-আবরার" নামে একটি দ্বীনি সাময়িকী প্রকাশ হতে যাচ্ছে যেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

দ্বীন ও ইসলামের প্রচার প্রসারে, মানবতার কল্যাণে হযরত ফক্বীহুল মিল্লাতের প্রজ্ঞাপূর্ণ অব্যাহত প্রয়াস ও প্রচেষ্টা সর্বমহলে স্বীকৃত। যার ঈর্ষণীয় প্রভাব গোটা দেশ নয় উপমহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও অনুভুত হয় ব্যাপকভাবে। বর্তমান সময়ে নবসৃষ্ট ফিৎনার মোকাবেলায় প্রয়োজন এই ধরনের সুস্থ চিন্তাধারার লিখনী শৃজনশীল ও শক্ত নেতৃত্বের তত্বাবধানে প্রকাশিত হওয়া। যার দ্বারা অতীত ও বর্তমানে সৃষ্ট সমাজের সকল গোমরাহী দূর করে নব প্রজন্মকে রক্ষা করা যায় ফিৎনা-ফাসাদের বিভীষিকাময় অন্ধকারের অতলগহ্বর থেকে।

আমি আশাবাদী

"আল-আবরার" অশান্ত মুসলিম সমাজের জন্য শান্তির শুভবার্তা রূপে প্রকাশ পাবে, ধারক ও বাহক হবে আকাবির ও আসলাফের আধ্যাত্মিক ও তাথ্যিক জ্ঞান ভাণ্ডারের।

"আল-আবরার" এর প্রতিটি সংখ্যা হবে প্রজ্ঞাবান আলিম, বিজ্ঞ ইসলামী ব্যক্তিবর্গের ক্ষুরধার লেখনী সম্বলিত। এটি তুলে ধরতে সক্ষম হবে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার আসলরূপ।

"আল-আবরার" হবে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতিক, পথহারা মানুষের সঠিক পথের দিশারী।

আমি দৃঢ় আশাবাদী

"আল-আবরার" পুণ্যবানদের আত্মার প্রশান্তি বয়ে আনবে, এর দ্বারা যুগোপযোগী নির্ভরযোগ্য চিন্তা ও গবেষণার দ্বার উন্মোচিত হবে।

"আল-আবরার" এর আত্মপ্রকাশে বাস্তবায়িত হল সমাজের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মানুষের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন।

মহান আল্লাহর দরবারে বিশেষ আকুতি, তিনি যেন এই প্রয়াসকে কবুল করেন এবং এটিকে দীর্ঘায়ূ দান করেন। আমীন।

সায়্যিদ আব্দুল মজীদ নদীম

মূল উর্দূ থেকে অনুদিত-সম্পাদক

সম্পাদকীয়

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লী আ'লা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বা'আদ

মহান রাব্বুল আলামীনের অপূর্ব দয়া ও অসংখ্য মেহেরবানী যে, তিনি মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা ঢাকা এর মাধ্যমে তাঁর দ্বীনের ইলম ও উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষাসহ সর্ববিদ দ্বীনি খিদমাত চালু রেখেছেন। যার উপকারিতা আজ পুরো উপমহাদেশে বিস্তৃত আলহামদু লিল্লাহ। অত্র প্রতিষ্ঠানের অধীনস্ত বিভাগসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটা জনকল্যাণ ও প্রকাশনামূলক বিভাগ হল ফক্বীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন। যেখান থেকে সমসাময়িক যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের উপর আরবী, উর্দূ, বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। যা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ উপকৃত হয়ে আসছে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ। আমার দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা ছিল যে, উক্ত বিভাগের তত্বাবধানে একটা দাওয়াতী সাময়িকী প্রকাশের। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি ও বিভিন্ন প্রতিকুল অবস্থার দরুন অনেক প্রত্যাশিত সেই মাসিকীর প্রকাশ সম্ভব হয়ে উঠেনি। পরম বাস্তবতা হল যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রত্যেক জিনিসের জন্য সময় নির্ধারিত থাকে। আল্লাহর মর্জি ও ইচ্ছা যখন হয় তখনই কেবল কোন জিনিস তার অস্তিত্ব লাভ করে। এর পূর্বে বান্দার শত ইচ্ছা থাকলেও বাস্তবায়ন হয় না। তাই আল্লাহর মর্জিতে এই বৎসর ফক্বীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা তাদের অনেক মেহনত ও পরিশ্রমের মাধ্যমে একটি সাময়িকী প্রকাশের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তারা আমার নিকট এই বরকতময় মাস তথা রবিউল আওয়ালে উক্ত সাময়িকী প্রকাশের অনুমতি চেয়েছে। আমি আলহামদু লিল্লাহ অত্যন্ত আনন্দের সাথে আল্লাহর উপর ভরসা করে উক্ত সাময়িকী প্রকাশের অনুমতি প্রদান করেছি। আশা করি ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই পাঠক সমাজের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটবে।

এই মাসিক পত্রিকায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সমসাময়িক বিষয়াবলী স্থান পেয়েছে। যেগুলো প্রস্তুত করেছেন আমার আস্থাভাজন দক্ষ ও নবীন কলমসৈনিকেরা। এই সাময়িকীর উদ্দেশ্য হল এর দ্বারা সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তথা বিশিষ্টজন ও সর্বসাধারনের মধ্যে দ্বীনের জযবা সৃষ্টি করা ও দ্বীন মুখী করা। যদ্দরুন সর্বসাধারণ ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত হয় ও সবার সাথে ধর্মীয় বন্ধন দৃঢ় থেকে সুদৃঢ়তর হয়। এবং ইসলামের সার্বজনীনতা ও স্থায়িত্ব প্রমাণিত হয়।

আনন্দের বিষয় হল তারা এই প্রকাশনার নামকরণ করেছে আমার মুরুব্বী ও মুরশিদ মুহিউসসুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব রহ. এর নামে "আল-আবরার" করে। যা আমার হৃদয়ের পছন্দনীয় নাম। আল্লাহ আমার শায়খকে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমীন।

প্রিয় পাঠকসমাজের নিকট আমার নিবেদন থাকবে, যদি তারা এই সাময়িকী দ্বারা উপকৃত হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য এবং পত্রিকার দীর্ঘায়ূ ও স্থায়িত্বের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দুআ করবে এবং এটাও মনে রাখবে, বান্দার কাজে ভুল ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। তাই কোথাও ভুল, ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হলে আল-আবরার পরিষদকে মেহেরবানী করে অবহিত করবে। পরিশেষে আল্লাহর দরবারে এই নতুন প্রকাশনার দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং প্রার্থনা করি যে, আল্লাহ তাআলা এর উপকারিতা সার্বজনীন করুন। আমীন।

dK¡xûjwgjøvZgydZxAvãyiingvb
cÖwZôvZvIÖavbc,ô‡cvlK
Avj-Aveivi

পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে

উচ্চতর কুরআন গবেষণা বিভাগ

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

انك لعلى خلق عظيم الآية

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর আখলাক সম্পর্কে মানব জাতিকে অবহিত করেছেন।

আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা)কে হুজুর সা. এর আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন আপনারা কি কুরআন শরীফ পড়েন নাই? কুরআনই হল হুজুর সা. এর আখলাক বা চরিত্র। ২। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন উক্ত আয়াতে হুজুর সা. এর চরিত্র বা আখলাক দ্বারা উদ্দেশ্য হল দ্বীনে ইসলাম। কেননা আল্লাহর কাছে ইসলাম ধর্মের চেয়ে প্রিয় কোন ধর্ম নাই। ৩। হযরত আলী রা. বলেন উক্ত আয়াতে خلق عظيم দ্বারা কুরআনে উল্লেখিত আদাব বা শিষ্টাচার গুলো বুঝানো হয়েছে। ৪। এক তফসীর অনুযায়ী خلق عظيم দ্বারা তিনটি নির্দেশ এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা হাদীছ শরীফের মধ্যে রাসূল সা. বর্ণনা করেছেন।

صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء اليك

"যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর। যে ব্যক্তি তোমার উপর জুলুম করে তুমি তাকে ক্ষমা কর। যে ব্যক্তি তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে তুমি তার সাথে সুন্দর আচরণ কর।"

উল্লেখিত তফসীর সমূহ থেকে বুঝা যায় কুরআন নির্দেশিত আখলাকসমূহ রাসূলুল্লাহ সা. এর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল।

৫। হযরত আনাস রা. বলেন আমি রাসূল সা. এর খেদমত করেছি পুরা দশটি বৎসর। অথচ তিনি কখনো আমাকে একথা বলেন নি যে তুমি একাজটি করলে না কেন? বা তুমি একাজটি কেন করেছ? (অথচ দশবৎসর এর মধ্যে অনেক কাজ রাসূল সা. এর তবীয়তের বিপরীত হওয়া স্বাভাবিক)।

৬। অন্য বর্ণনায় হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূল সা. এত নম্র আখলাকের অধিকারী ছিলেন যে, মদীনার যে কোন একজন মেয়ে শিশু হুজুর স. এর হাত ধরে যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে নিয়ে যেতেন।

৭। হযরত আয়েশা রা. বলেন রাসূল সা. নিজ হাতে কখনো কাউকেও প্রহার করেন নাই। এমনকি কোন বাঁদী, গোলাম, কিংবা স্ত্রীদেরকেও কখনও প্রহার করেন নি।

৮। হযরত জাবের রা. বলেন রাসূলুল্লাহ সা. এর কাছে কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনও না বলতেন না।

৯। হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন কাল কেয়ামতের দিন আমলনামায় সুন্দর আখলাকের চেয়ে ভারী কোন আমল থাকবে না।

১০। হযরত আয়েশা রা. বলেন হুজুর সা. কখনও অশুভ আচরণ করতেন না, অশালীন কথা বার্তা বলতেন না। কখনও খারাপ আচরণের প্রতিশোধ নিতেন না।

১১। হযরত আনাস রা. বলেন আমি একদা হুজুর সা. এর সাথে চলতে ছিলাম, হঠাৎ করে এক গ্রাম্য লোক এসে হুজুর সা. এর চাদর মোবারক ধরে জোরে টান দিলেন, এমনকি হুজুর সা. এর গলায় চাদরের দাগ লেগে গেল। সে বলল আমাকে কিছু মাল প্রদান করুন। হুজুর সা. তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং হাসলেন। অত:পর তার জন্য কিছু মাল বরাদ্দ করলেন।

রাসূল সা. এর আদর্শ সম্পর্কে শুধু মুসলমানরা নয় বরং অনেক অমুসলিম মনিষীও হাজার হাজার পৃষ্ঠা লিখে ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

১২। আজ থেকে আনুমানিক একশত বৎসর পূর্বে ভারতের পাঠনা শহরে একটি মাসিক পত্রিকা বের হত, নাম ছিল نور اسلام "নূরে ইসলাম" উক্ত পত্রিকায় ভারতের এক হিন্দু লিখক হুজুর সা. এর আদর্শ সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করেছেন: আমি মুসলমানদের নবী মুহাম্মদ সা. কে সর্বকালের মহামানব হিসাবে স্বীকার করি। কেননা তাঁর জীবন এমন বিচিত্রময় যা অন্য কোন মনিষীর মধ্যে পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে কি এমন কোন বাদশাহ পাওয়া

যাবে? যার রাজধানীর দিকে শত শত উট মাল পত্র নিয়ে আসবে অথচ তার বাড়িতে মাসের পর মাস চুলা জলবে না। দিনের পর দিন অনাহারে জীবন অতিবাহিত করবে। এত নম্র এত ভদ্র কখনো কারো গায়ে হাত দিবে না। আল্লাহর সাথে এমন সম্পর্ক কখনো কখনো নিজের আপনজনকেও চিনবে না, নিজের শত্রুদের জন্য সদা সর্বদা দু'আ করতে থাকবে। একাগ্রচিত্তে দিনে রাতে এবাদতে মাশগুল থাকবে। তাকে যখন "শাহে আরব" আরবের বাদশাহ বলে ডাকা হবে তখন খেজুর গাছের নীচে বিছানা ছাড়া খালিবদনে শুয়ে থাকবে। নিজের সাহাবাদের জন্য গোলাম বাঁদী ভাগ বাটোয়ারা করবে অথচ নিজ মেয়ে কলিজার টুকরোর গায়ে যাতাকলের দাগ পড়া সত্বেও গোলাম বাঁদী দেওয়ার পরিবর্তে তাসবীহ পড়ার নির্দেশ দিবে।

এবং নিজ কন্যাকে বলবে ওহুদের এতীমগণ তোমার পূর্বে দরখাস্ত করে রেখেছে। হ্যাঁ এসব বিচিত্রময় আদর্শের অধিকারী হলেন একমাত্র মুসলমানদের নবী হযরত মুহাম্মদ সা.। তাইতো "দিহাঞ্জেড" এর লিখক একজন খৃষ্টান হয়েও নিজ নবী ঈসা আ. এর উপর নবী মুহাম্মদ সা.কে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য হয়েছেন।

সূত্রসমূহ:
১। তাফসীরে ইবনে কাছীর ২। মাআরেফুল কুরআন। ৩। তাফসীরে মাজহারী। ৪। খুলাছাতুল আনওয়ার। ৫। মুসলিম শরীফ।৬। বুখারী শরীফ। ৭। তিরমিযী শরীফ। ৮। নছরুলবারী।

লেখা আহবান **লেখা আহবান** **লেখা আহবান**

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, মহান আল্লাহ তাআলার রহমতের উপর নির্ভর করে ইনশাআল্লাহ নিয়মিত প্রকাশনার জগতে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে বহুদিনের প্রতীক্ষিত সময়ের চাহিদা পূরণে আহলে সুন্নাত ওয়ালজামাআতের দাওয়াতী ও আত্মশুদ্ধী মূলক একটি একনিষ্ট মুখপত্র মাসিক আল-আবরার।

তাই আল-আবরার পরিবার অত্যন্ত আনন্দের সাথে আহবান জানাচ্ছে, সমাজের বিজ্ঞ, দক্ষ, সহনশীল ও মননশীল ইসলামিক স্কলার, গবেষক, কবি, সাহিত্যিক ও লেখকদের মূল্যবান তাত্ত্বিক লিখনী ও কবিতার, যা পূরণ করবে সমাজের ইসলাম প্রিয় সর্বসাধারণের ধর্মীয় চাহিদা ও মিটাবে তাদের পিপাসা।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী

১। লেখককে অবশ্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী হতে হবে।
২। লেখকের পূর্ণ ঠিকানা পেশ করতে হবে।
৩। লেখা বিষয়ভিত্তিক, যুগোপযোগী, গবেষণালব্ধ ও তত্ত্ববহুল হতে হবে।
৪। কোন সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক ও বিতর্কিত লেখা গ্রহণযোগ্য হবে না।
৫। প্রত্যেক বিষয়ের রেফারেন্স সবিস্তারে সাথে উল্লেখ থাকতে হবে।
৬। লেখা এ৪ সাইজের কাগজে এক পীঠে কম্পোজ করে দিতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণযোগ্য হবে না।
৭। সম্পাদনা দফতর লেখা নির্বাচন, কাটছাট করার সম্পূর্ণ ইখতিয়ার রাখবে।
৮। অনির্বাচিত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না।
৯। লেখা প্রতি আরবী মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে সম্পাদনা দফতরে পৌছতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রকাশনা দফতরঃ মাসিক আল-আবরার
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ,
ব্লক ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত স্মরণী, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, বাড্ডা, ঢাকা।

পবিত্র সুন্নাহ থেকে

উচ্চতর হাদীছ গবেষণা বিভাগ
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "ماامرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا" (ابن ماجه ١/٩رقم الحديث ١)

" হযরত আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সা. এরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে যে, বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছি তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেছি তা থেকে বিরত থাক। (ইবনে মাজাহ খণ্ড ১পৃ: ৯ হাদীছ- ১)

عن ابى هريرةرضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ دعونى ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بسوالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فأتوا منه مااستطعتم (البخارى ٨/٤٩٢ رقم الحديث٧٢٨٨)

"হযরত আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের জন্য যা রেখে দিয়েছি তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাক। কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ধ্বংস হয়েছে তারা তাদের নবীগণকে বিভিন্ন প্রশ্ন ও তাদের মতানৈক্যের কারণেই, সুতরাং তোমাদেরকে আমি যে বিষয়ে নিষেধ করেছি তা থেকে বিরত থাক। আর যখন কোন বিষয়ে নির্দেশ দেয় তা তোমরা তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী কর। (বুখারী শরীফ খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৯২, হাদীছ নং ৭২৮৮)

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : ويقول فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد ﷺ وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة(مسلم ٢/٥٩٢ رقم الحديث ٤٣)

"হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, সবচেয়ে উত্তম কথা হল আল্লাহর কিতাব (কুরআন) আর সবচেয়ে উত্তম হিদায়াত হল রাসূলের সা. হিদায়াত (হাদীছ-সুন্নাহ) আর সর্ব নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে দ্বীনের বিষয়ে নবসৃষ্ট বিদআত এবং সকল বিদআতই পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহী। (মুসলিম শরীফ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৯২, হাদীছ নং ৪৩)

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله ﷺ قال: كل امتى يدخلون الجنة الا من ابى قالوا يارسول الله ومن يأبى قال من اطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد ابى. (البخارى ٨/٤٨٩ رقم الحديث ٧٢٨٠)

হযরত আবুহুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে কিন্তু যে অস্বীকার করবে সে নয় (অর্থাৎ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না) সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! অস্বীকারকারী কে? রাসূল সা. বললেন, যে আমার অনুসরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার অবাধ্যতা করে সেই অস্বীকার করে। (বুখারী শরীফ খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৮৯, হাদীছ নং ৭২৯০)

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله ﷺ من اطاعنى فقد اطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله عز وجل (سنن ابن ماجه ١/١٠ رقم الحديث ٣)

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যে আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল আর যে আমার অবাধ্যতা করল সে আল্লাহর অবাধ্যতা করল। (অর্থাৎ আমার সুন্নাতের অনুসরণই আল্লাহর আনুগত্য এবং আমার সুন্নাতের অবাধ্যচারনই হলো আল্লাহর অবাধ্যতা। (ইবনে মাজা শরীফ খণ্ড-১ পৃষ্ঠা-১০, হাদীছ নং ৩)

عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ عليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (ابو داؤد ٥/١٤رقم الحديث ٤٦٠٧، ترمذى ٥/٤٣ رقم الحديث ٧٢٨٠)

হযরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, তোমরা আমার পর হিদায়াত ও সঠিক পথপ্রাপ্ত আমার খোলাফাদের সুন্নাতকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং মাড়ির দাঁত দ্বারা সেগুলো আঁকড়ে ধরবে (অর্থাৎ তাদের সুন্নাতসমূহের পূর্ণ অনুসরণ করবে দ্বীনের ব্যাপারে) এবং দ্বীনের ব্যাপারে নতুন সৃষ্ট বিষয়াবলী থেকে দূরে থাকবে। কেননা সকল নতুন সৃষ্ট বিষয়ই বিদআত আর সকল বিদআতই গোমরাহী। (আবু দাউদ খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৪, হাদীছ নং ৪৬০৭, তিরমিযী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৩, হাদীছ নং ৭২৮০)

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ من احدث فى امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد (البخارى ٣/٢٢٩ رقم الحديث ٢٦٩٧)

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দ্বীনের বিষয়ে দ্বীন বহির্ভূত নতুন কিছুর সংযোজন করবে তা প্রত্যাখ্যাত বলে বিবেচিত হবে। (বুখারী শরীফ খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২২৯, হাদীছ নং ২৬৯৭)

দরসে ফিক্বহ

শরীয়তের দৃষ্টিতে অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ ও সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা

মুফতী শাহেদ রহমানী

বর্তমান সময়ে ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিশ্বের বেশ কিছু উন্নয়নশীল অমুসলিম দেশে ভিনদেশী লোকদেরকে সেদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করার প্রথা চালু করেছে। ফলে বিভিন্ন মুসলিম দেশের মুসলমানরা বিশেষ করে অনুন্নত দেশসমূহ থেকে নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করে সে সকল দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করছে। নাগরিকত্ব নিয়ে অনেকে ফিরে আসছে, স্থায়ীভাবে বসবাস করছে অনেকে। নিজ মাতৃভূমি মুসলিম দেশ ত্যাগ করে অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ কতটুকু শরীয়ত সম্মত এমন প্রশ্ন উঁকি দেয় অনেকের অন্তরে। সন্দেহ ও সংশয়ের দোলায় দুলতে থাকে বিষয়টি নিয়ে। তাই শরীয়া দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হল।

কোন অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে স্থায়ী ভাবে বসবাস করা শরীয়তের এমন একটি বিষয় যার বিধান স্থান, কাল পাত্রভেদে এবং বসবাসকারীদের উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন:

১। যদি কোন মুসলমানের উপর স্বদেশে কোন অন্যায় অভিযোগ ও অপরাধ ছাড়াই অত্যাচার নির্যাতন চালানো হয়, বেআইনীভাবে কারাগারে অন্তরীণ করে রাখা হয় অথবা তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হয়; এমতাবস্থায় কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া এসব জুলুম অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার যদি কোন পথ খোলা না থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা এবং সেই দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তথায় অবস্থান করা নিঃসন্দেহে জায়েয হবে। তবে শর্ত হল এই যে, তাকে এ ব্যাপারে প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে যে, সেখানে গিয়ে তার জীবন চলার পথে ধর্মীয় অনুশাসন পুরোপুরি মেনে চলবে। সেখানকার প্রচলিত যাবতীয় মন্দকাজ ও কুসংস্কার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

২। যদি কোন ব্যক্তি অর্থনৈতিকভাবে চরম সংকটে নিপতিত হয় এবং বহু চেষ্টা-প্রচেষ্টার পরও যদি নিজের মুসলিম রাষ্ট্রে জীবিকা নির্বাহের কোনো সুযোগ সৃষ্টি না হয়, এমনকি এখানে সে এক মুঠো আহারেরও মুখাপেক্ষী হয়। এমতাবস্থায় যদি কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে তার বৈধ কোন চাকুরীর ব্যবস্থা হয়ে যায়, আর এই সুযোগে যদি সে সেই অমুসলিম দেশে বসবাস শুরু করে দেয় তাহলে (এক নম্বর ধারায় বর্ণিত দুইটি শর্তের সাথে) তার জন্য সেখানে বসবাস করা জায়েয হবে। কেননা, অন্যান্য ফরজ সমূহের মধ্যে হালাল উপার্জন ও একটি অন্যতম ফরজ। যার জন্য শরীয়ত কোন স্থান বা কোন জায়গাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়নি। বরং এর জন্য রয়েছে ব্যাপকতার সাধারণ অনুমতি। পবিত্র কুআনে হালাল রুজী অন্বেষনের জন্য যে কোন স্থানে গমণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

"তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। অতএব তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে। (সূরা মুলক: আয়াত-১৫)

৩। যদি কোন লোক কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে এই নিয়তে বসবাস করে যে, সে দেশে অবস্থানরত অমুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছাবে, তাদেরকে মুসলমান বানাবে। অথবা সেখানে অবস্থানরত মুসলমানদের দ্বীন ও শরীয়তের সহীহ তালীম দেবে। দ্বীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য শরীয়তের আহকাম ও বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করবে। এ জাতীয় নিয়তে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা শুধু জায়েযই নয় বরং একটি বিরাট ছওয়াব ও পূণ্যময় কাজ। অসংখ্য সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন এই মহৎ উদ্দেশ্যে ও সৎ নিয়ত নিয়ে বিভিন্ন অমুসলিম দেশে বসবাস করেছেন। পরবর্তীকালে এগুলো তাঁদের জীবনে উত্তম ও সৎকর্ম এবং তাঁদের বর্ণাঢ্য জীবনের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

৪।কোন ব্যক্তির যদি স্বদেশে এই পরিমাণ জীবিকার বন্দোবস্ত থাকে যার মাধ্যমে সেই শহরে অবস্থানরত অন্যান্য মানুষের জীবন চলার মান অনুযায়ী সেও চলতে সক্ষম হয়। তারপরও শুধু জীবন চলার মান আরো উন্নত করার উদ্দেশ্যে সম্পদ বৃদ্ধি এবং আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসের জীবন যাপনের লক্ষ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত করে থাকে, তাহলে এ জাতীয় হিজরত মাকরূহের আওতাভুক্ত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ কোনরূপ ধর্মীয় বা পার্থিব প্রয়োজন ছাড়া সেই রাষ্ট্রে বসবাস তাদের প্রচলিত অপসংস্কৃতির স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়ারই নামান্তর হবে। বিনা প্রয়োজনে নিজের দ্বীন-ধর্ম এবং আখলাক -চরিত্রকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া কোনক্রমেই ঠিক হবে না। কারণ অভিজ্ঞতার আলোকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কেবল আরাম আয়েশ, ভোগ-বিলাস এবং সুখের জীবন যাপনের লক্ষ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে থাকে, তার মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি দূর্বল হয়ে পড়ে এবং খুব দ্রুতই এ ধরনের মানুষ বিধর্মীদের আচার-আচরণের জোয়ারে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়।

একারণেই হাদীস শরীফে তীব্র প্রয়োজন ছাড়া মুশরিকদের সাথে বসবাস করার নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এ সম্পর্কে আবু দাউদ শরীফে হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) থেকে একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। "যে ব্যক্তি মুশরিকদের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং তাদের সঙ্গে বসবাস করে, সে তাদেরই ন্যায়। (আবু দাউদ)

হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "আমি ওইসব মুসলমানদের থেকে দায়মুক্ত যারা মুশরিকদের সাথে বসবাস করে। সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল" এর কারণ কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে ইরশাদ করেন, ইসলামের অগ্নি আর কুফরের অগ্নি একই সঙ্গে থাকতে পারে না। তোমরা এটি পৃথক করতে পারবে না যে, এটি কি মুসলমানদের অগ্নি না মুশরিকদের অগ্নি।

বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের অনেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদের ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্নভাবে। যেমন কোন কোন বিজ্ঞ আলেমের কাছে এর অর্থ হল এই যে, হুকুমের ক্ষেত্রে মুসলমান আর মুশরিক সমকক্ষ হতে পারে না। উভয়ের বিধানাবলী ভিন্ন ভিন্ন। আবার কোন কোন আলেম বলেছেন, এই হাদীসের সারমর্ম হল এই যে, আল্লাহ তাআলা দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফরকে ভিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন। সুতরাং কোন মুসলমানের জন্য কাফেরদের রাষ্ট্রে তাদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করা জায়েয নেই। কারণ, যখন মুশরিকরা তাদের (বিজয়ের) মশাল সমুজ্জল করবে, আর তাদের সঙ্গে মুসলমানরা নীরবতা অবলম্বন করে থাকবে, তখন বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটিই মনে হবে যে, তারা (মুসলমনগণ) এদেরই অন্তর্ভুক্ত। উলামায়ে কেরামের এই ব্যাখ্যা দ্বারা একথাও পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে যে, যদি কোন মুসলমান ব্যবসা-বানিজ্যের উদ্দেশ্যেও কাফেরদের রাষ্ট্রে গমণ করে তাহলে তার জন্য সেখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় অবস্থান করা মাকরূহ। (মাআলিমুস সুনান লিল-খাত্তাবী- খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা ৪৩৭)

হযরত মাকহুল (রা) থেকে সুনানে আবু দাউদের মারাসিলে বর্ণিত হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিজের সন্তানদের মুশরিকদের মধ্যে বিচরণ করতে দিও না। (তাহযীবুস সুনান: খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৩৭)

একারণেই ফুকাহায়ে কেরাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কেবলমাত্র চাকুরী করার উদ্দেশ্যে কোন মুসলমানের অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা এবং তাদের জনসংখ্যা বর্ধিত করার কারণ হওয়া এমন একটি (ঘৃণিত) কাজ, যার দ্বারা তার বিশ্বস্ততা ক্ষুন্ন হয়ে যায়। (তাকমিলা রাদ্দুল মুহতার খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ১০১)

৫। কোনো ব্যক্তি যদি লোক সমাজে সম্মানিত হওয়ার আকাংখায় কিংবা অন্য মুসলমানের উপর নিজের বড়ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে কিংবা দারুল কুফরের নাগরিকত্ব এবং জাতীয়তাকে দারুল ইসলামের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত মনে করে তাদের ন্যাশনালিটি গ্রহণ করে থাকে অথবা তার পার্থিব জীবনের থাকা-খাওয়া ও চাল চলনে তাদের নীতি গ্রহণ করে বাহ্যিক জীবনে তাদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করার জন্য এবং তাদের ন্যায় হয়ে যাওয়ার জন্য বসবাস করে থাকে তাহলে এ জাতীয় যে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা সম্পূর্ণ রূপে হারাম হিসেবে গণ্য হবে। এই বিষয়টি এমন সুস্পষ্ট যে, এর জন্য কোন দলীল পেশ করার প্রয়োজন নেই।

অনুসরণে: ফিকহী মোকালাত।
মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী (দা বা)

হযরত ওয়ালা ফক্বীহুল মিল্লাত দা: এর
ইরশাদসমূহ

(হযরত ওয়ালা ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম বসুন্ধরা মারকাযের জামে মসজিদে ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে দেয়া সমসাময়িক বিভিন্ন মালফুজাত থেকে সংগৃহীত)

☆ হযরত ওয়ালা বলেন, যেই ত্বালেবে ইল্‌ম স্বীয় আসাতিযায়ে কেরামের সাথে ভাল আচরণ করবে, তাদের অনুগত হবে ও দুআ নিবে সে কামিয়াব হবে। তার পড়া বুঝে আসুক বা নাই আসুক ভবিষ্যতে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের খেদমতের জন্য তাকে কবূল করে নিবে।

☆ হযরত ওয়ালা বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত থানভী রহ. কে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! আপনি হাজারের অধিক কিতাব লিখেছেন, না জানি কতই না কিতাব আপনি মুত্বালাআ করেছেন? জবাবে হযরত বললেন, না ভাই! আপনারা যেসব কিতাব পড়েছেন আমিও তা পড়েছি। তবে আমি তিনজন ক্বুতুব ও মুত্বালাআ' করেছি: হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ., ফক্বীহুন নফ্‌স হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী রহ. ও হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানূতভী রহ.। এর দ্বারা হযরতের উদ্দেশ্য ছিল, শুধু কিতাব পড়ার দ্বারা কাজ হয় না বরং কিতাব পড়ার সাথে ক্বুতুব তথা আল্লাহওয়ালা এর সুহবতও জরুরী। শুধু কিতাবই যদি মানুষের হেদায়তের জন্য যথেষ্ট হতো তাহলে রসূল পাঠানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। এর বিপরীত আল্লাহওয়ালাদের সোহবত কারো নসীব হলে কিতাব ছাড়াও হেদায়ত পেতে পারে। যেমন সাহাবায়ে কেরাম উম্মী হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র সোহবতের দ্বারা ঐ মক্বাম হাসেল হয়েছিল যদ্দরুণ তাঁদের নামের সাথে رضى الله عنه পড়তে বাধ্য হয়ে যায়।

☆ মুরীদের তরক্কীর জন্য মাঝে মাঝে শায়খের সোহবতে হাজির হওয়া জরুরী। কেউ অপারগ হলে শায়খের আক্বীদত ও মহাববত বৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে থাকবে- ইন্‌শা-আল্লাহ সোহবতের মতই উপকার হবে।

☆ হযরত থানভী রহ. বলেছেন, যে ব্যক্তি চারটি জিনিসের প্রতি যত্নবান হবে সে আল্লাহওয়ালা হয়ে যাবে। ১- دوام ذكر الله সদা সর্বদা আল্লাহপাকের যিকিরে থাকা বিশেষ ভাবে উপরে উঠতে আল্লাহু আকবর, নীচে নামতে সুবহানাল্লাহ, সমতলে চলার সময় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং প্রতিটি কাজ ও ক্ষেত্রে মসনূন দুআগুলো গুরুত্বের সাথে আদায় করা। ২: صحبت اهل الله আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে বসা। ৩: اتباع سنت رسول ﷺ প্রত্যেক কাজে সুন্নতের অনুসরণ করা। ৪: اجتناب عن معصية الله সমস্ত গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করা। ভুলে কোন সময় গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবা করা।

☆ এক জন মুসলমানের ভুলে গুনাহ হতে পারে, বারবার হতে পারে। কিন্তু মুসলমান ব্যক্তি ইচ্ছা করে গুনাহ করতে পারে না। ইচ্ছা করে গুনাহ করলে ঈমানহারা হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা।

☆ বাড়ীতে মহিলাদের এমনভাবে অবস্থান করা যাতে হাঁটার আওয়াযও বাড়ীর পুরুষের কানে না পৌঁছে ।

☆ মাদরাসার আসাতিযায়ে কেরাম তাহাজ্জুদগুজার হলে ত্বালিবে ইলমদের ফজরের নামায তাকবীরে উলার সাথে পড়ার আশা করা যায়। আর যদি উস্তাদ নিজেই তাকবীরে উলা পায় তখন ত্বালিবে ইলমদের মসবূক হওয়ার সম্ভাবনা। আর যদি উস্তাদ মসবূক হয় তাহলে ত্বালিবে ইলমদের ফজরের নামায ক্বাযা হওয়ার সম্ভাবনা।

☆ যখন কোন গায়রে মহরম আত্মীয়া যেমন : চাচী-মামী ইত্যাদি তোমার সামনে চলে আসবে তখন তুমি চক্ষুদ্বয় নিচু করে নিবে এবং যেসব কথা জিজ্ঞেস করবে চোখ না তুলে উত্তর দিবে। কেউ মাথা নীচু করে রাখছ কেন জিজ্ঞেস করলে জবাব দিবে, ভাল লাগছে না। এভাবে আস্তে আস্তে গায়রে মহরম মহিলাদের লজ্জায় তোমার সামনে আসা বন্ধ হয়ে যাবে ও তোমার জন্য শরয়ী পর্দা করা সহজ হয়ে যাবে। সাবধান! মুখে কিছু বলবে না।

☆ জিরী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত আহমদ হাসান রহ. যে কোন মাহফিলে বয়ান শেষে দু'আয় বলতেন, ইয়া আল্লাহ সিরাতে মুস্তাকীমের উপর জিন্দা রাখ, সীরাতে মুস্তাকীমের উপর মওত নসীব কর। শুধুমাত্র ঈমানের উপর মওত নসীব হওয়ার দু'আ করতেন না। কেননা ঈমানের উপর মওত নসীব হলেই সীরাতে মুস্তাকীমের উপর হওয়া জরুরী না।

☆ আমাদের আকাবিরগণ যুগ যুগ ধরে দ্বীনের খেদমত করেছেন বিনিময় ছাড়া। সমস্ত নবী রসূলগণ দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে বলেছেন, হে লোক সকল! আমি এই দাওয়াতের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না। প্রতিদান এক মাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে চায়। এই জন্য দ্বীনের যে কোন খেদমত বিনিময় ছাড়া আঞ্জাম দেওয়া নববী আদর্শ। আমরা কমজুর, তাই না নিয়ে পারছিনা। তবে মায়ের দুধের মত মনে করার দরকার নেই। অতএব বেতনও নিতে থাকেন, দোয়াও করতে থাকেন, ইয়া আল্লাহ বিনিময় না নিয়ে পড়ানোর তৌফিক দান করুন। ইন্‌শা-আল্লাহ দু'আর বরকতে হয়তো বিনিময় না নেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে অথবা আল্লাহপাক মেহেরবানী করে বেতন না নিয়ে পড়ানোর সওয়াব দান করবেন।

☆ ইরশাদ করেন, ইমামের পিছনে শুধুমাত্র ঐ সব লোকেরা দাঁড়াবে যারা ইমামতির উপযুক্ত। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

ليلينى منكم الو الاحلام والنهى

তোমাদের মধ্যে যারা বালেগ ও বিজ্ঞ আলেম তারাই আমার পিছনে দাঁড়াবে। কেননা, ইমাম সাহেবের যদি কোন ভুল হয় অথবা ওযর পেশ আসে তখন ইমাম সাহেব চুপে চুপে চলে যাবে আর যে ব্যক্তি পিছনে থাকবে সে ইমামের স্থলাভিষিক্ত হবে। অতএব যার ইমাম হওয়ার যোগ্যতা আছে এমন ব্যক্তি ইমামের পিছনে দাঁড়ানোর উপযুক্ত। তাদের জন্য ইমামের পিছনে জায়গা খালি রাখতে সমস্যা নেই। বরং এটাই শরীয়তের চাহিদা। সুতরাং মসজিদ কমিটির সভাপতি-সেক্রেটারী ইমামের পিছনে জায়গা নির্দিষ্ট করার হকদার মনে করা ভুল।

☆ মসজিদে কোন প্রয়োজনীয় কথা বলতে হলে একমাত্র ইমাম সাহেব বলবেন। এছাড়া আর কেউ নয়।

☆ রসূলুল্লাহ সা. জুমার দিন ফজরের নামাযে সূরা الم سجده ও دهر পড়তেন। ফুকাহায়ে কেরাম এই দুই সূরা পড়াকে বাধ্যতামূলক করতে নিষেধ করেছেন। এখন আমরা এর বিপরীত না পড়াকে বাধ্যতা মূলক করে নিয়েছি। তাই আমরা এই সুন্নত মাদ্রাসার মসজিদসমূহে চালু করার চেষ্টা করি। কাকরাইল মসজিদে উক্ত সুন্নত চালু করার জন্য ফতোয়া চেয়ে ছিল, আমরা নিষেধ করে দিয়েছি। যেহেতু ওখানের নামাযে নতুন নতুন নামাযী ও সাধারণ লোকেরা শরীক হয় তাই নামাযে হযবরল অবস্থাসৃষ্টির প্রবল আশংকা।

☆ নামাযে ইমাম সাহেবকে লোকমা দেওয়া কোন সওয়াবের কাজ নয়। ইমাম সাহেব সংশ্লিষ্ট সূরা ভুলে গেলে লোকমার অপেক্ষায় না থেকে অন্য সুরায় চলে যাবে।

☆ আমাদের আকাবিরগণ জুমাবার কুরআন হাদীস শিক্ষা দানের মত ফজীলতপূর্ণ কাজ বন্ধ রেখেছেন আমল করার জন্য। তাই জুমার দিনের আমলসমূহ তথা ভালভাবে গোসল সেরে সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া, সুরায়ে কাহাফ তেলাওয়াত করা, সলাতুত তাসবীহ আদায় করা, আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত যিকির আযকারে থেকে বেলা ডুবার কিছুক্ষণ পূর্বে দুআ করা ইত্যাদির প্রতি আসাতেযায়ে কেরাম ও তুলাবাদের গুরুত্ব দেওয়া খুবই জরুরী।

☆ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার নামায সারা বৎসর সূর্য ঢলার সাথে সাথে আদায় করেছেন। অথচ জুহুরের নামায গরম কালে দেরিতে নিজে পড়েছেন এবং উম্মতকেও নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমরা জুমার দিন সকালের খানা ও ক্বায়লূলা নামাযের পর করতাম।

☆ বসুন্ধরা মারকায থেকে হেফ্‌জ সমাপনকারী ত্বালেবে ইল্‌মদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা আল্লাহপাকের খাস মেহেরবানীতে পূর্ণ কুরআন শরীফ হেফ্‌জ করতে পেরেছ। মনে রাখবে রমজান মাসে খতম তারাবীহ পড়ে কোন টাকা-পয়সা নিবে না। এমনকি কেউ হাদিয়ার নামে দিলেও নিবে না। বরং আল্লাহপাক তোমাদেরকে কুরআন শরীফ হেফ্‌জ করার নিয়ামত দান করেছেন তার শুকরিয়া হিসেবে কুরআন শুনাবে।

পটিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা কালে যখন আমার বেতন ছিল ত্রিশ টাকা। তখন আমার এক সাথী হাফেজ সাহেব রমজান মাসে চট্টগ্রাম শহরে খতম তারাবী পড়িয়ে এক হাজার টাকা পেত, যা আমার প্রায় তিন বৎসরের বেতন সমান। হিসাব অনুযায়ী তার গাড়ী-বাড়ী সব হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার বর্তমান অবস্থা খুবই করুণ। আল্‌হামদু লিল্লাহ ঐ হাফেজ সাহেবের খিদমতের সুযোগ আল্লাহ তাআলা আমাকে দান করেছেন।

☆ যেই হাফেজ সাহেব খতম তারাবীর বিনিময়ে টাকা-পয়সা নেয় তার শেষ জীবনে অভাবে কষ্ট পেতে হয়।

☆ তিনটি কারণে হাফেজরা আলেম হয় না, হলেও ভাল আলেম হয় না। ১. উস্তাদ আলেম নাহলে। কারণ হাফেজ উস্তাদ সাহেব আলেম না হলে ছাত্রদেরকে বলে বেড়ায় ''তোমার সিনায় ত্রিশ পারা কুরআন আছে, আর কি লাগবে?'' একথা শুনে ছাত্রের অন্তরে আলেম হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ জন্মে না। ২. বালেগ হওয়ার পর হেফ্‌জ করতে গিয়ে কোরআন শরীফের যথাযথ আদব রক্ষা না হলে। কেননা, বালেগ হওয়ার পর কোরআর শরীফ হেফ্‌জ করলে কুরআন শরীফের সাথে বেআদবী হয়ে গেলে তার তিক্ততা তাকে ভোগ করতে হয়। ৩. খতম তারাবী পড়িয়ে বিনিময় নিলে।

☆ এমন কাজ করবেন যার দ্বারা অন্তর থেকে দু'আ বের হয়। আপনার দু'আ চাইতে হবে না। এজন্য এক বুজুর্গ বলেন, দু'আ পাওয়ার কাজ কর, দু'আ চাইতে হবে না।

☆ ফিকাহ বাদ দিয়ে সরাসরি হাদীস থেকে মাসআলা বের করতে মনে চাইলে ১২ বৎসর পর্যন্ত কেন ফিকাহ পড়া হল? ফিকাহের গন্ডি থেকে বের হয়ে হাদীসের শরাহ করা মনের চাহিদা পূরন করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

☆ জাকির নায়েক আসলে কি করতে চাচ্ছে তা কারো বুঝে আসছেনা। যাই করতে চায় না কেন ইন্‌শা-আল্লাহ কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অতিতের বাতিলদের মতই পরিণতি হবে।

☆ সাবেক এক সচিবকে কথা প্রসঙ্গে বললাম, আপনারা ব্যাংকের অফিসারদেরকে টুপি পরায়তে চান, কিন্তু টাই পরতে নিষেধ করেন না কেন? সচিব সাহেব বললেন, দেখতে তো একটু খারাপই লাগে। ব্যাংকের এমডি সাহেব বললেন, টাই পরলে কি অসুবিধা? জাকির নায়েক তো ইসলামের কথাও বলে, টাইও পরে। আমি বললাম, অসুবিধা কি তা পরে বলব। তবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, কারো কোন মাসআলা জানা না থাকলে যারা সত্যিকার অর্থে আলেম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন। কিন্তু আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই, যে লোক জীবনের পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজি ও মেডিকেল শিক্ষায় ব্যয় করল সে হঠাৎ ছাব্বিশ বৎসরে এসে মুহাদ্দিস হয়ে গেল কি ভাবে? তখন এম.ডি সাহেব নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

☆ শেয়ার বাজারে না যাওয়ার জন্য আমরা অনেক বার সতর্ক করেছি। কারণ এটা ধোকা ও প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। বর্তমান শেয়ার বাজারে বিশাল ধবস নেমেছে। বড় মুসিবতের কারণ হয়ে গেছে। তবে মনে রাখতে হবে, মুসিবত ও পেরেশানী আল্লাহতাআলার পক্ষ থেকে আসে, অবশ্যই কোন হেকমত থাকে।

গ্রন্থনায়ঃ মাওলানা লোকমান
উস্তাদঃ মদীনাতুল উলূম মাদরাসা, ঢাকা।

৩৯পৃষ্ঠার পরঃ

তখন জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লহর রাসূল! মনে হয় এটা বিদায় উপদেশ। সুতরাং আমাদেরকে কিছু অসিয়ত করুন তখন তিনি বললেন , আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করছি : ১- আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার, ২- এবং (আমীরের কথা) শুনার ও মানার। যদিও তিনি হন হাবশী (নিগ্রো) দাস কেননা তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে সে বহুমতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের উপর আমার সুন্নাত (আদর্শ) এবং হেদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত পালন করা জরুরী। তোমরা এ সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর এবং তা মাড়ির দন্ত দিয়ে চেপে ধর। এবং তোমরা বিশেষভাবে (দ্বীনের নামে বেলা দলীল) নব আবিস্কৃত বস্তু সমূহ থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, এ (জাতীয়) নব আবিস্কৃত প্রত্যেক বিষয় বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআত গুমরাহী বা পথ ভ্রষ্টতা। তবে যারা আরবী ভাষায় অজ্ঞ মানুষকে শরীয়তের হুকুম আহকাম বুঝানোর যুক্তি দিয়ে বাংলা ভাষায় খুৎবা প্রদানের দাবীদার তাদের জন্য খুৎবার পূর্বে কিংবা নামাযের পরে নিজ ভাষায় ওয়াজ নসীহত করাই সমীচিন। এতে স্বর্ণযুগের অনুস্মরণ ও যারা আরবী বুঝে না তাদের উপকার হবে।

আল্লাহ পাক বিশ্ব মুসলিমকে রাসূল (সা:) এর সঠিক আদর্শে আদর্শবান হওয়ার তৌফীক দান করুন। আমীন।

পবিত্র কুরআনের আলোকে

উম্মতের উপর অর্পিত মহানবীর (সা) হক সমূহ

মাওলানা আনোয়ার হুসাইন

অবতরনিকা:

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমগ্র সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করার পূর্বে কলমকে যখন সৃষ্টি করেন, কলমকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ করেন, হে কলম লিখ। কলম আল্লাহর দরবারে সবিনয়ে আরজ পেশ করল, আল্লাহ! কি লিখব? আল্লাহর নির্দেশ হল লিখ।

لا اله الا انا ومحمد رسولى

অর্থাৎ কোন উপাস্য নেই আমি ছাড়া এবং মুহাম্মদ (সা) আমার রাসূল। পরম দয়ালু আল্লাহ আমাদেরকে তথা গোটা মানবজাতিকে সঠিক পথ দান করেছেন সেই মহামানব মুহাম্মদ (সা) এর মাধ্যমে। যাকে উভয় জাহানের রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন মানবকুলে। যার সুপারিস অনিবার্য হবে সব উম্মতের নাজাত লাভের তরে। সে মহামানবের প্রতি উম্মতের নরনারীর উপর অর্পিত দায়িত্ব ও হকের বিষয়ে স্বয়ং আল্লাহ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশী গ্রন্থ কুরআনে করীমে কি নির্দেশনা প্রদান করেছেন তার যথসামান্য আলোচনার প্রয়াস এই ক্ষুদ্র লিখনী। পরম দয়ালূ আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ ক্ষুদ্র এই প্রয়াসকে কবুলিয়াত দান করুন।

১.

মহানবী (সা) এর প্রতি ঈমান:

মহানবী (সা) এর নবুওয়াত ও রিসালাত যেহেতু কুরআনে পাকের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ এবং প্রকাশ্য ও জ্বাজ্জল্যমান মু'জিযাসমূহ দ্বারা অকাট্টভাবে প্রমাণিত, তাই তার প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যে সব হুকুম আহকাম নিয়ে এসেছেন সে সব হুকুম আহকাম ও যাবতীয় বিষয়াবলীকে বিশ্বাস করা ফরজ ও একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, "তোমরা আল্লাহর উপর তার রাসূল এর উপর এবং যে নূর আমি নাযিল করেছি সে নূরের উপর ঈমান আন।" (সূরা আত্তাগাবুন)

মহানবী (সা)এর প্রতি ঈমানের অর্থ:

আল্লাহর রাসূলের (সা) প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ হচ্ছে যে, এই মর্মে তাঁর রেসালাত ও নুবওয়াতকে সত্য বলে একীন ও দৃঢ় বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে মাখলূকাতের প্রতি নবী ও রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি যে শরীয়ত তথা বিধি-বিধান নিয়ে আগমন করেছেন সে সব সম্পর্কেও আন্তরিক বিশ্বাস রাখবে যে, এগুলো সব সত্য ও হক এবং আদেশ নিষেধ যা কিছু তিনি বর্ণনা করেছেন সবই হক ও সত্য। আন্তরিক এই বিশ্বাস ও একীনের সাথে সাথে সে মোতাবেক মুখে স্বীকারও করা এবং স্বাক্ষ্য প্রদান করা।

২.

প্রিয় নবী (সা) এর ইতাআত এবং আনুগত্য একান্ত অপরিহার্য:

মহানবী (সা) কে আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রাসূলরূপে স্বীকার করে নেয়া এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন সেসব হুকুম আহকাম ও শরীয়তের প্রতি আন্তরিক আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার পর স্বভাবতই তাঁর আনুগত্য ও ইতাআত একান্ত অপরিহার্য হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, "হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা) আনুগত্য কর এবং তাঁর নির্দেশ মান্য করা থেকে মুখ ফিরিয়োনা। (সূরা আনফাল)

মহানবী (সা)এর আনুগত্যের অর্থ:

নবী করীম (সা) এর ইতাআত ও আনুগত্যের অর্থ হচ্ছে যে কোন হুকুম ও বিধান তিনি বর্ণনা করেছেন সে সবকিছুকে মেনে নেয়া। এগুলোর উপর আনুগত্য প্রকাশ করে প্রতিটি কথা ও বিষয়ের উপর আমল করা। কেননা নবী করীম (সা) এর কথা ও বিষয়ের উপর আমল করা প্রকৃত পক্ষে কুরআনের উপর আমল করারই নামান্তর। কারণ নবী করীম (সা) এর আনুগত্য ও অনুসরনের নির্দেশ স্বয়ং কুরআনেই দেয়া হয়েছে। যেমন পূর্বোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। এছাড়া পবিত্র কুরআনে একথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি যে কথা বা যে কাজেরই হুকুম করে থাকেন কিংবা কোন নিষেধাজ্ঞা দিয়ে থাকেন, সব আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেকই হয়ে থাকে। নিজের মনগড়া বা বানোয়াট কোন

হুকুম তিনি করেন না। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "তিনি মনগড়া কোন কথা বলেন না বরং তা হয় খালেছ ওয়াহী যা তাঁর প্রতি প্রেরণ করা হয়"। (সূরা আননাজম)

৩.

মহানবী (সা) এর সুন্নাত, আদত ও স্বভাব-চরিত্রের অনুসরণঃ

সাইয়িদুল মুরসালীন (সা) এর সুন্নাত এবং তাঁর মোবারক আদত ও উন্নত স্বভাব চরিত্রের অনুসরণ করাও উম্মতের উপর একান্ত জরুরী। যেমন মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "হে রাসূল! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তাআলাও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের সব গোনাহ মাফ করে দিবেন। আর আল্লাহ তাআলা বড় ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু। " (সূরা আলে ইমরান)

রাসূল (সা) এর আদর্শের অর্থঃ

প্রখ্যাত বুজুর্গ হাকীম মুহাম্মদ ইবনে আলী তিরমিযী (রহ) বলেন, রাসূল (সা) এর আদর্শের মধ্যে উত্তম আদর্শ হলো এই যে, শরীয়তের বিষয়াবলীতে মহানবী (সা) এর আনুগত্য করা এবং তাঁর সুন্নাতের ইত্তিবা করা। কথায় ও কাজে মহানবী (সা) এর সামগ্রিক পবিত্র জীবনের কোন অবস্থার বিপরীত পথ ও পন্থা অবলম্বন না করা। অধিকাংশ মুফাসসেরীনে কেরাম এই অর্থ বর্ণনা করেছেন।

সলফে সালেহীনদের ইত্তিবায়ে সুন্নাতঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এর নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে আবু আব্দুর রহমান! নি:স্বন্দেহে সালাতুল খাওফ এবং সালাতুল হাযর এর আলোচনা আমরা পবিত্র কুরআনে পাই। কিন্তু সফরের নামাযের কোন আলোচনাতো কুরআনে পাই না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) জবাব দিলেন, ভাতিজা! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা)কে আমাদের নিকট এমন অবস্থায় নবী করে পাঠিয়েছেন যে, তখন আমরা কিছুই জানতাম না। সুতরাং আমরা তেমনি আমল করতে থাকব যেমন রাসূল (সা) কে করতে দেখেছি। অর্থাৎ রাসূল (সা)কে আমরা সফর অবস্থায় নামায কসর পড়তে দেখেছি, সুতরাং সফরের সময় আমরা নামায কসরই পড়ব। পবিত্র কুরআনকে আমাদের চেয়ে তিনি বেশি জানতেন। তার উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে সফরের অবস্থায় কসর পড়তে হুকুম দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, "কসরের নামায আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি একটা দান। সুতরাং আল্লাহ তাআলার দানকে তোমরা কবুল কর। (মিশকাত শরীফ) এই পবিত্র হাদীছে "তোমরা কবুল কর" একটা নির্দেশ বাক্য। আর কোন বিষয় ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়া হয়। অতএব সফররত অবস্থায় নামায কসর করা ওয়াজিব। ইমাম আবু হানীফা (রহ) এর অভিমত এটাই।

সারমর্ম হলো এই যে, রাসূল (সা) শরীয়তের আহকামও বিধিবিধানকে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। তাই যে কোন ব্যক্তি এই দুইটির যে কোন একটিকে ছেড়ে দিবে সে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ঠ হয়ে যাবে।

মহানবী (সা) এর সুন্নাতের উপর আমল করা পবিত্র কুরআনের প্রতি বিশ্বাসের নামান্তরঃ

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে " রাসূল (সা) তোমাদেরকে যে বিষয়ের হুকুম করেন, তোমরা সে অনুযায়ী আমল কর এবং তিনি যে বিষয় থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক।" (সূরা আলহাশর)

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, মহানবী (সা) এর সুন্নাতের উপর আমল করা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর কিতাবকে সত্য বলে বিশ্বাস করার নামান্তর। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআনের প্রতি ঈমান রাখবে সে অবশ্যই নবীজীর সুন্নাতের উপর আমল করবে।

৪.

প্রিয় নবী (সা) এর হুকুম ও সুন্নাত তরক না করাঃ

একথা যখন প্রমাণিত হয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর যাবতীয় হুকুম ও নির্দেশের ইত্তিবা করা অপিহার্য তখন এতে এটাও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, নবী (সা) এর কোন হুকুম ও নির্দেশ তরক করা এবং কোন সুন্নাতের বিরোধিতা করা সম্পূর্ণ রূপে না জায়েয। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে বরবাদী ও ধ্বংসের কারণ হবে। আল্লাহ তাআলা এমন লোকদের জন্য কঠিন আযাবের ধমক দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "সুতরাং যারা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচারণ করে তাদের এই ভয়

হওয়া উচিৎ যে, তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে কিংবা তাদের উপর কোন যন্ত্রণাময় আযাব নাযিল হয়ে পড়ে"। (সূরা আননূর) আরো ইরশাদ হয়েছে যে, " আর যে ব্যক্তি রাসূল এর বিরোধিতা করবে, তার নিকট সত্য বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুসলমানদের পথ পরিত্যাগ করে অন্য পথ অবলম্বন করবে, আমি তাকে করতে দেব সে যা কিছু করে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব আর এটা হল নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল"। (সূরা আন নিসা)

৫.

মহানবী (সা) এর প্রতি মুহাব্বতঃ

আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবীব (সা) এর প্রতি প্রাণগত মুহাব্বত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, "আপনি বলে দিন যদি তোমাদের পিতৃবর্গ এবং তোমাদের পুত্রগণ এবং তোমাদের ভ্রাতাগণ এবং তোমাদের স্ত্রীগণ এবং তোমাদের স্বগোত্র আর সে সকল ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ এবং সে ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা করছ আর সে গৃহগুলো যা তোমরা পছন্দ করছ (যদি এই সব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এর চেয়ে এবং তাঁর রাস্তায় জেহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ তাআলা নিজের নির্দেশ (শাস্তি) পঠিয়ে দেন। আর আল্লাহ তাআলা আদেশ অমান্যকারীদেরকে তাদের উদ্দিষ্ট স্থল পর্যন্ত পৌছান না।" (সূরা আততাওবা)

রাসূল (সা) এর প্রতি মহাব্বতের নিদর্শনঃ

প্রতিটি জিনিসেরই এমন কিছু আলামত নির্দশন ও চিহ্ন থাকে, যা দ্বারা সে জিনিসটির ভাল মন্দ ও আসল-নকলের পরিচয় পাওয়া যায় এমনিভাবে প্রকৃত মহাব্বত ও ভালবাসার কিছু আলামত ও নিদর্শন রয়েছে। তাহল মানুষ যখন কাউকে মহাব্বত করে ও ভালবাসে তখন সে তার ভালবাসার মানুষটিকে নিজের জীবনের উপরেও প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যে কোন বিষয়ে সে তার প্রেমাস্পদের আনুগত্য ও অনুসরণ করে। তার সন্তুষ্টির বিপরীতে সে কোন কাজ করে না। যদি কারো মধ্যে এই সকল নিদর্শন পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে সে তার মহাব্বত ও ভালবাসায় দৃঢ় ও পরম সত্যবাদী। অপরদিকে যদি কারো মধ্যে এই নিদর্শন দেখতে না পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে সে তার মহাব্বত ও ভালবাসার দাবীতে নির্লজ্জ ও মিথ্যাবাদী। এমনিভাবে যে কোন ব্যক্তিই রাসূলে কারীম (সা) এর প্রতি মহাব্বত ও ভালবাসার দাবী করতে পারে। কিন্তু সত্যিকার প্রেমিক তাকেই মনে করা হবে, যার মধ্যে মহাব্বতের আলামত ও নিদর্শন পাওয়া যাবে।

নবী প্রেমের কয়েকটি নিদর্শন ও আলামত নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, আমার মধ্যে এর কয়টি নিদর্শন রয়েছে। বা নবীপ্রেমের কী পরিমাণ রয়েছে।

* এত্তেবায়ে শরীয়তঃ রাসূল (সা) কর্তৃক আনিত শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা।

* নবী (সা) এর প্রতিটি বরকতময় সুন্নাতের উপর আমল করা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি অবস্থায় তার হুকুম আহকাম ও নির্দেশাবলীর ইত্তিবা, অনুসরণ করা। তিনি ওয়াজিব বা মুস্তাহাব যে কোনভাবে যে সকল বিষয়ের হুকুম করেছেন, তা যাথাযথ বাস্তবায়ন করা। যে সকল বিষয় হতে নিষেধ করেছেন সতর্কতার সাথে সেগুলো হতে বেঁচে থাকা।

* রসূলের সম্মান ও আদব করা। অভাব-অনটন, সম্পদ-প্রাচুর্য, সুখ-দু:খ, শোক ও আনন্দ সর্বাবস্থায় রাসূল (সা) এর মর্যাদা ও আদবের খেয়াল রাখা। জীবনের সর্বাবস্থায় তাঁর সুমহান আদর্শ, চরিত্র অনুশীলন করা।

* মহানবী (সা) এর হুকুমকে নিজের কামনা-বাসনার উপর প্রাধান্য দেয়া। মহানবী (সা) যে সকল বিষয় পালনের নির্দেশ করেছেন বা উদ্বুদ্ধ করেছেন ঐ গুলো করার ব্যাপারে মনের চাহিদা ও আকাংখার উপরে প্রাধান্য দেয়া।

* আল্লাহ ও রাসূলের (সা) হুকুমের সামনে অন্য কারো পরওয়া না করা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করা এবং সে অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে যদি কোন বান্দা অসন্তুষ্টও হয় তবুও এর কোন পরওয়া না করা। যদিও সে পিতা-মাতা আপনজন সন্তান সন্ততিই হোক না কেন।

* সুন্নাত জিন্দা করা ও প্রচার করা। রাসূলে করীম (সা) এর সুন্নাতসমূহ জীবন্ত ও সজীব রাখা এবং এগুলোর প্রচার প্রসারে সচেষ্ট থাকা।

* মহানবী (সা)কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করা তথা উঠা-বসা, চলাফেরা, নির্জনে

লোকালয়ে সর্বাবস্থায় প্রিয় নবীজীকে স্মরণ করা।

* মহানবী (সা) এর আলোচনার সময় তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং নিজের মধ্যে বিনয় ও নম্রতার ভাব ফুটিয়ে তোলা।

* পবিত্র রাওজা শরীফের যেয়ারতের তীব্র আকাংখা রাখা। কেননা সত্যিকারের আশেকের জন্য প্রিয়তমের স্মৃতিবিজড়িত ঘর বাড়ি ও অন্যান্য নিদর্শনাদী দর্শন করাও কিছুটা প্রশান্তির কারণ হয়ে থাকে।

* মহানবী (সা) কে স্বপ্নে দেখার আকাংখা রাখা।

* মহানবী (সা)এর পরিবার পরিজনের প্রতি মহাব্বত। মহানবী (সা) এর বংশধর ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি মহাব্বত রাখা।

* সাহাবায়েকেরামের প্রতি মহাব্বত। রাসূলে করীম (সা) এর সকল সাহাবায়েকেরামের প্রতি মহাব্বত রাখাও তাঁর প্রতি মহাব্বত রাখার নিদর্শন।

* রাসূল (সা)এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি মহাব্বত। যাদের সাথে প্রিয় নবীজীর মহাব্বত ও সম্পর্ক ছিল তাদের সকলের সাথে মহাব্বত ও সম্পর্ক রাখা।

* পবিত্র কুরআনের প্রতি মহাব্বত। এই পবিত্র কুরআন মহানবী (সা) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এর দ্বারা মানুষ হেদায়াত লাভ করেছে। স্বয়ং নবীজী এর উপর আমল করেছেন এবং কুরআনের মত করেই তিনি তাঁর চরিত্র মাধুর্য গড়ে তুলেছেন।

* সমগ্র মুসলিম উম্মাহর প্রতি মহাব্বত।

* সুন্নাতের বিরোধীতাকারীদের থেকে দূরে থাকা। যে ব্যক্তি রাসূলে কারীম (সা) এর সুন্নাতের বিরোধীতা করবে এবং দ্বীনের মধ্যে ভিত্তিহীন নতুন নতুন কথাও বিদআত আবিস্কার করবে তাদের থেকে দূরে থাকা।

* সুন্নাতের বিরোধীতা দেখে ঘৃণা পোষণ করা। যে কোন বিষয় রাসূল (সা) এর শরীয়তের বিরোধী হবে এগুলোর প্রতি ঘৃণা পোষণ করা। এগুলোকে মিটিয়ে দেয়া ও মূলোৎপাটনের জন্য অপরিহার্য কর্তব্যরূপে সর্বাত্মক সচেষ্ট থাকা। ইত্যাদি।

৬.

রাসূলে করীম (সা) এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদনঃ

নবী করীম (সা)কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা উম্মতের প্রতিটি নর-নারীর উপর ফরজ। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন। "হে মুহাম্মদ! আপনাকে আমি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠিয়েছি। যেন তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর, তাঁকে সাহায্য কর এবং তাঁকে সম্মান কর।" (সূরাতুল ফাতাহ)

সম্মান প্রদর্শনকারীদের জন্য তিনটি পুরস্কারঃ

ক) তাকওয়া খ) মাগফিরাত গ) বিরাট প্রতিদান। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয়ই যারা আপন আওয়াজকে রাসূলুল্লাহর সামনে নীচু করে তারা ঐসমস্ত লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ তাআলা তাকওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তাদের জন্য মাগফিরাত ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে।" (সূরা আল হুজারাত)

৭.

অধিক পরিমাণে মহানবী (সা) এর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করাঃ

মহনবী (সা) এর যে সমস্ত হক্ব বা প্রাপ্য আমাদের কাছে রয়েছে তম্মধ্যে অন্যতম হল তাঁর প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ ও সালামের হাদিয়া পেশ করা। মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবী (সা) এর প্রতি রহমত পাঠান। অতএব হে ঈমানদাররা তোমরাও তার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাও।" (সূরাতুল আহযাব) উক্ত আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন প্রিয় নবীজীর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠানোর আদেশ করেছেন। যদ্বারা দরূদ ও সালাম পাঠের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়। তাই অধিকাংশ আলেমের মতে জীবনে কমপক্ষে একবার দরূদ পড়া ফরজ। আর কতক আলেমের মতে যখনই প্রিয় নবীজীর পবিত্র নাম আসে তখনই দরূদ পড়া ওয়াজিব। হানাফী আলেমদের এব্যাপারে দু'ধরনের উক্তিই রয়েছে। ইমাম কারখী (রহ) প্রথমোক্ত উক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর ইমাম তাহাবী (রহ) দ্বিতীয় উক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

পরিশিষ্টঃ

পবিত্র কুরআন উদ্ধৃত উল্লেখিত হুকুক যথাযথ আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে সফলতা ও কামিয়াবী দান করুন এবং সত্যিকার আশিকে রাসূল (সা) হিসাবে 'ইহয়ায়ে সুন্নাত' ও 'ইমাতাতে বিদ'আত' তথা সুন্নাত পূনরোজ্জীবিত করণ ও বিদআতের মুলোৎপাটনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক: উস্তাদ, মারকাযুল ইকতিসাদ বাংলাদেশ।

মহানবী সা. এর জীবনাদর্শে আছে আমাদের শান্তি ও মুক্তি

- মুফতী রফীকুল ইসলাম আল মাদানী

শান্তি ও মুক্তির দূত মহানবী সা.। ঐক্য, সম্প্রীতি, সাম্য-মৈত্রী ও সৌহার্দ্যপূর্ণ স্বর্গীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন তিনি। তাঁরই আদর্শ অনুসরণে দূর্ভেদ্য প্রাচীরের মত দাঁড়াতে পারে একটি ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ জাতি। একমাত্র তাঁর অনুসৃত আদর্শই সর্বস্তরের মানবের ইহ ও পরকালের চির কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। উপহার দিতে পারে আনন্দ জীবন, বিনয়ী ও আত্মত্যাগী মানব, শ্রেণীহীন বৈষম্যহীন নির্মল স্বাচ্ছন্দ সমাজ, গড়তে পারে দ্বন্দ্বমুখর এই ধরায় আবার সৌভ্রাতৃত্বের অকৃত্রিম বন্ধন, শান্তি-সুখের অনন্য নীড়।

এ শুধু মুখনিঃসৃত প্রলাপ নয়, নয় শুধু মোহময় বাণী। ইতিহাসের পাতায় রয়েছে এর ঝলমল নমুনা, বাস্তব আদর্শ। মদীনায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে মহানবী সা. তা দেখিয়ে গেছেন সবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে। প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বের কাহিনী, যুগের নামটাই ছিল অন্ধকার জাহেলী সমাজ, মানবসভ্যতা অধঃপতনের শোচনীয় অধ্যায়, গোটা আরব তখন অজ্ঞতা আর পৈশাচিকতার কৃষ্ণ নেকাবে আচ্ছাদিত। মনুষ্যত্ব বিবর্জিত বিশ্ববাসীর পাশবিক জীবনের ভয়াবহ বিভীষিকা তখন অভিশপ্ত ইবলিসকেও লজ্জিত করেছিল। তাদের অমানবিক তাণ্ডবলীলায় বিধ্বস্ত হচ্ছিল জগতের প্রতিটি অঞ্চল,অষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছিল সভ্যতা আর মানবতাকে। নারীর ছিলনা দাবী জ্ঞাপনের সামান্যতম অধিকার। দাসত্বের কঠিন শৃংখলে আবদ্ধ করে ভূলুণ্ঠিত করেছিল স্বাধীনতার মুক্তাকাশ। নগন্যতম বিষয় নিয়ে হানাহানি-মারামারি চলত যুগ যুগ ধরে। ঐক্য, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতির আশা ছিল ঐ সমাজের অরণ্যে রোদন। এক কথায় দশ দিক থেকে ধেয়ে এসেছিল অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণ ও অমানবিকতার ঝড় সাইমুম। অসহায় মানবতার বুকফাটা রুদ্ধ শ্বাসের মধ্য দিয়ে যেন প্রতিভাত হচ্ছিল:

ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا

"হে আমাদের প্রভূ! আমাদেরকে এই অত্যাচারী জনপদ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করুন! আর আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী প্রেরণ করুন!" (আননিসা-৭৫)

মজলুম মানবতার হৃদয়বিদারক আর্তনাদে স্পন্দিত হয়েছিল মহামহিম বিদাতার আরশে আজীম। সুখ-শান্তি, ঐক্য, সম্প্রীতি ও স্বাচ্ছন্দ্যময় স্বর্গীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি প্রেরণ করেন মানবতার নবী মুক্তির দূত মুহাম্মদ সা.কে। মহানবী সা. ইসলামের অমৃত সুধা পৌঁছে দেন ঘরে ঘরে। ঘোর অমানিশা কাটিয়ে ঐশী জ্যোতিতে আলোকোজ্জ্বল করেছিলেন গোটা সমাজটাকে। নৈতিক অবক্ষয়ের চরম বিপর্যয় রোধ করে, তাহজীব তামাদ্দুনের ভিত সুদৃঢ় করেছিলেন তিনি। তাঁর আনিত মহামুক্তির পয়গাম ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বজোড়ে। বর্ষিত হয় এই আলমে রহমতের বারিধারা। শত বছরের তপ্ত তাপিত ধরার বুকে প্রবাহিত হয় ঐক্য-সম্প্রীতির পুণ্য পীযূষ ধারা। দলে দলে মানুষ এসে তাঁর পতাকা তলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে আরম্ভ করে, সবার মুখে উচ্চারিত হয়েছিল لا اله الا الله "নেই নেই, নেই কোন মাবূদ আল্লাহ ছাড়া।"

তাদের হানাহানি সেদিন রূপ নেয় ভালবাসায়, কপটতা পাল্টে আসে উদারতা, নিজে না খেয়ে অপরকে খাওয়ানোর শিক্ষাও তারা পেয়েছিল। পেয়েছিল বিনয় ও আত্মত্যাগের পরম শিক্ষা, প্রতিশোধের পরিবর্তে ধৈর্য, সহনশীলতা এবং ক্ষমা করার আদর্শ। শত বছরের শত্রুও সেদিন পরিণত হয়েছিল আপন বন্ধু হিসেবে। তাইতো শান্তিকামী কবি হাতছানি দিয়ে বলছেন:

সৃষ্টির সেরা তুমি, তুমি চির সুন্দর
আদর্শের মূর্ত প্রতিক তুমি চির ভাস্কর
তুমি মুক্তির দূত ওগো কেতনধারী
তোমার সোনালী ছোয়ায় সুখ পেয়েছে
আবাল বৃদ্ধা নারী।

রাসূলে খোদা সা. এক দিকে ছিলেন দিশেহারা জাতির সার্বিক কল্যাণের খোদায়ী রাহবার, অপর দিকে ছিলেন গণমানুষের মৌলিক চাহিদা এবং আইন শৃংখলা ও নিরাপত্তা বিধানকারী মহান রাষ্ট্রনায়ক-খলীফাতুল্লাহ।

এমনিভাবে রণক্ষেত্রে ছিলেন সেনাধ্যক্ষ সিপাহসালার, সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ সমাজসেবক। পারিবারিক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অসাধারণ গৃহকর্তা। মানব কল্যাণে তিনি ছিলেন দরদী প্রাণ মহানুভব ও উদার চিত্ত। এক কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আপামর বিশ্ববাসীর জন্য এক অনন্য আদর্শ।

এ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্যেই আল্লাহ পাক আমাদেরকে ডেকে বলছেন:

واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها

"আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে অত:পর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। (আলে ইমরান-১০৩)

আধুনিক সভ্যজগতের অধিবাসী আমরা, প্রযুক্তির অগ্রগতি উপহার দিয়েছে নতুন সমাজ, সভ্যতার চরম উৎকর্ষতা সাধন করেছে-এই সমাজের দাবী। কিন্তু এত কিছুর পরেও শান্তি নামক কাঙ্খিত বস্তুটি আমাদের নাগালের বাহিরে। ইউরোপীয় মননশীলতায় সামাজিক অবস্থা তিমির আঁধারে নিমজ্জিত। ইসলামের সোনালী অধ্যায় থেকে এ সমাজ দূরে-অনেক দূরে। পৃথিবীর শান্তিকামীরা যেখানেই সৌভ্রাতৃত্বের নীড় গড়ার স্বপ্ন আঁকছে সেখানেই বিধ্বস্ত হচ্ছে অশুভ হস্তের হিংস্র থাবায়। অশান্তি, অরাজকতা, শোষন, অত্যাচার, মারামারি, হানাহানি, খুন, সন্ত্রাস, হিংসা- বিদ্বেষ ও পরনিন্দা আজকের সমাজের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐক্য সম্প্রীতি এ সমাজে সোনার হরিন, তাই মানবতার কবি ফররুখ বলেছেন:

মানবেতর জীবনের অভিশাপে
তিলে তিলে মৃত্যু কামনা করে
মুক্তির আশায়।

মানবতার এই বিড়ম্বনার কি শেষ নেই? প্রতিবিধান নেই? মানবেতর জীবনের কি প্রতিকার নেই? নেই কি কোন সমাধান? সমাধানের একই পথ- চাকা ঘুরাতে হবে পনেরশ' বছর পূর্বের দিকে। ইসলাম ছাড়া অন্য যাবতীয় তন্ত্র-মন্ত্র এ সমস্যার সমাধান দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে ও হচ্ছে। এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্যে আল্লাহ পাক দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন:

والف بين قلوبهم لو انفقت مافى الارض جميعا ماالفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم

"তিনিই মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের বন্ধনে সম্প্রীতি সঞ্চার করেছেন, যদি তুমি সব কিছু ব্যায় করে ফেলতে যা কিছু পৃথিবীতে আছে, তাদের মনে মোটেও সম্প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ ইসলামের আদর্শে তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করেছেন। (আল আনফাল-৬৩)

ইসলাম একটা সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যেখানে অন্যায় নেই। উগ্রতা নেই, শোষন-নিপীড়ন নেই। নেই প্রতিশোধের জঘন্য প্রবণতা। আছে শুধু বিনয়, আত্মত্যাগের বিস্ময়কর কাহিনী, ধৈর্য-সহনশীলতার সচিত্র উদাহরণ আর উদারতার নির্মল আদর্শ। অতএব, মানবতার চরম বিপর্যয় ও বিড়ম্বনার ইতি টেনে এ পৃথিবীতে আবারও সুখ-শান্তির নীড় গড়ার লক্ষ্যে, স্বর্গীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার মানসে মুক্তির দূত মহানবী সা. এর আদর্শ অনুসরণের বিকল্প নেই।

পরিশেষে, মতভেদ ভুলে যাই, অভিমান ছেড়ে দিই, আল্লাহর রজ্জুকে ধরি শক্ত করে, রাসূলের সা. আদর্শকে অনুসরণ করি পদে পদে। আর পৃথিবী তার সুপ্ত মানবতাবোধ ফিরে পেয়ে শান্তি সলিলে সবুজ হয়ে উঠুক, সবার অনাগত ভবিষ্যৎ শান্তি-সম্প্রীতিতে রঙ্গীন হোক, আরো সুন্দর হোক, সফল হোক, হেসে উঠুক আনন্দের ঝলমলে প্রভাত।

লেখক: উস্তাদ মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার তত্বাবধানে চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ ময়দানে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনের ২০১৫ পর্যন্ত তারিখ ঘোষণা

২০১৩	৬,৭,৮ ফেব্রুয়ারী	বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার
২০১৪	৫,৬,৭ ফেব্রুয়ারী	বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার
২০১৫	৪,৫,৬ ফেব্রুয়ারী	বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার

প্রচারে: সম্মেলন কর্তৃপক্ষ

যাদের ত্যাগে দেশব্যাপী

আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন

হক্কানী উলামায়ে কেরামের অনন্য ও বৃহৎ একটি দাওয়াতী মিশন আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন। যা দেশের বড় বড় জেলা শহরসমূহে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারী মাস ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাই সম্মেলনের ইতিহাস ঐতিহ্য পাঠকদের সামনে তুলে ধরেতেই এই প্রতিবেদন। -আল-আবরার পরিবার

কওমী মাদরাসাসমূহের দাওয়াতী কর্মসূচীসমূহের অন্যতম কর্মসূচী হলো ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সঠিক দ্বীন ও ধর্ম পালনে উদ্বুদ্ধ করা। এর বাস্তবায়ন বিভিন্নভাবে হয়ে আসছে। কওমী মাদরাসাসমূহের বার্ষিক সভাসমূহও এর অংশ বিশেষ। তাছাড়া বাড়ী বাড়ী ওয়াজ মাহফিল করা, ঘরে ঘরে গিয়ে পরিবারের সদস্যদেরকে একত্র করে ওয়াজ নসীহত শোনানো, পীর-মাশায়েখ ও মুরুব্বীগণকে বাড়ী বাড়ী দাওয়াত দিয়ে তাদের হাতে বাইআত মুরীদ হওয়া, খানকায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ওয়াজ নসীহতের আয়োজন করা ইত্যাদির মাধ্যমে দাওয়াতী প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হতো প্রাচীন কাল থেকে।

আজ থেকে প্রায় ৩০/৩৫ বছর পূর্বে কওমী আলেমগণ এই প্রোগ্রামকে আরো ব্যাপক করার চিন্তাভাবনা করেন। মাদরাসার গণ্ডি হতে বের হয়ে সভা-সমাবেশ করার প্রক্রিয়ায় রত হন। দেখা যেত মাদরাসার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সমচিন্তাধারার লোক বা মুহিব্বীনদের নিয়ে ওয়াজ মাহফিল করা হতো। যার ধারাবাহিকতা এখনও অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ ধরনের কাজ ও পদক্ষেপ চট্টগ্রামের আলজামিয়া আলইসলামিয়া পটিয়া কেন্দ্রিকই শুরু হয়। তৎকালীন পটিয়ার কিছু সংখ্যক যুবক আলেম এ কাজের সূচনায় ভুমিকা রাখেন। যাদের পৃষ্ঠপোষক, সার্বিক অভিভাবক ও পরামর্শদাতা ছিলেন আলজামিয়া পটিয়ার সাবেক সহকারী মহাপরিচালক হযরতুল আল্লাম মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (দাঃ বাঃ)। উদ্যোক্তাদের কেউ কেউ এখন জান্নাতবাসীও হয়ে গেছেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন বগুড়া জামিল মাদরাসার বর্তমান নায়েবে মুহতামিম আলজামিয়া পটিয়ার সাবেক মুহাদ্দিস মাওলানা আব্দুল হক্ব হক্কানী, হযরত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেবের সুযোগ্য সাহেবযাদা বর্তমান উত্তরবঙ্গ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মুফতী হাফেজ মুহাম্মদ আরশদ, মাওঃ আব্দুন্নুর (নূরু সওদাগর) এবং পটিয়া মাদরাসার তৎকালীন সদরুল মুদাররেসীন হযরত ইমাম সাহেব হুজুরের সুযোগ্য সন্তান মরহুম মাওলানা হাফেজ উবাইদুল্লাহ রহ. প্রমূখ। এ কাজে উদ্যোক্তাদের সার্বিক সহযোগিতা দেন আলজামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক কুতবে জামান, হযরতুল আল্লাম মুফতী আজীজুল হক্ব (রহঃ) এর সুযোগ্য সাহেবযাদা মাওলানা মুহামদ ইসমাঈল সাহেব ও জামিয়া পটিয়ার সাবেক শূরা সদস্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হযরত মাওলানা আনোয়ারুল হাকীম সাহেব প্রমূখ। তাঁদের উদ্যোগ ও সহযোগিতায় পটিয়ার ঈদগাহ ময়দান, ছিবাতলী স্কুল ও রেলওয়ে চত্তর ইত্যাদি স্থানে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হত। মাদ্রাসার চৌহদ্দী পেরিয়ে অরাজনৈতিকভাবে সম্মেলন,ওয়াজ মাহফিল করার ভাবনা এটাই সর্বপ্রথম, বিশেষ করে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। এই পদক্ষেপ বাস্তবায়নে বাতিলপন্থীদের বহু ঘাত প্রতিঘাতের শিকার হতে হয়েছে তাদেরকে, সহ্য করতে হয়েছে ভয়াবহ জুলুম অত্যাচারের মত অনেক কিছু।

আমরাও তখন পটিয়া মাদরাসার ছাত্র। অনেক বিষয় তো আমরা স্বচক্ষেই অবলোকন করেছি। একদা পটিয়ার ঈদগাহ ময়দানে ইসলামী সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছিল। মুরুব্বীগণ মঞ্চে বসা। পটিয়া মাদরাসার তৎকালীন কিরাত বিভাগের উস্তাদ কারী মূসা সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। তাঁর কিরআতের সূর যেন পটিয়াবাসীর হৃদয়ের তারে তারে বেজে উঠে এবং দল মত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ

অস্বাভাবিকভাবে সম্মেলনের দিকে ফড়িং এর মত ঝাপিয়ে পড়তে আরম্ভ করে। ঈর্ষান্বিত ভ্রান্ত আকীদা পোষণকারী লোকদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাদের কতিপয় উশৃংখল যুবক মিলে ট্রান্সফর্মার থেকে বিদ্যুতের পুরো সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। যাতে সম্মেলনের মাইক বন্ধ হয়ে যায়। উদ্যোক্তাদের কেউ কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারা দুস্কৃতিকারীকে ধরে এনে এক নিরবচ্ছিন্ন স্থানে বন্দী করে রাখে। সম্মেলন সমাপ্ত হওয়ার পরই তাকে ছাড়া হয়। দেখা যেতো বিভিন্ন স্থানে মাইকিং করতে গিয়ে অনেকেই লাঞ্ছিত হয়েছেন, অনেক ছাত্র অপহরণ ও প্রহারের শিকার হয়েছে।

এমনি ভয়াবহ ও নাজুক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয় এই কাজের উদ্যোক্তাদের। কোন বাধা বিপত্তির তোয়াক্কা না করে ছোট এই উদ্যোগকে আরো বড় উদ্যোগে কিভাবে পরিণত করা যায় এই ফিকরই ছিলো তাদের মধ্যে। ক্রমান্বয়ে তাঁরাই পটিয়ার ঐতিহাসিক রাহাতআলী উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে ব্যাপক আকারে সম্মেলন করার উদ্যোগ নেয়।

এসব সে কালের কথা যখন দেশের বড় বড় মুরুব্বীর উপস্থিতিতে পটিয়ার সম্মেলনসমূহের মঞ্চ আলোকিত থাকত। জামিয়া পটিয়ার মহাপরিচালক হযরতুল আললাম হাজী মুহাম্মদ ইউনুস সাহেব রহ., নানুপুর মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরতুল আললাম মাওলানা সুলতান আহমদ নানুপুরী সাহেব রহ., জামিয়া পটিয়ার মুরুব্বী হযরতুল আললাম মাওলানা আলী আহমদ বোয়ালভী সাহেব রহ., জামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরতুল আল্লাম মুফতী আযীযুল হক্ব রহ. এর খলীফা হযরতুল আল্লাম মাওলানা মেহেরুজ্জামান সাহেব রহ., পটিয়া মাদরাসার সহকারী মহাপরিচালক হযরতুল আল্লাম মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব, প্রখ্যাত ওয়ায়েজ পীরে কামেল হযরতুল আল্লাম মুজাহেরুল ইসলাম রহ.প্রমূখের রূহানী বয়ান এবং মোনাজাতে যখন শ্রোতাদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যেত। যখন প্রখ্যাত ওয়ায়েজ হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিসবাহ রহ. প্রমূখ উদীয়মান ওয়ায়েয হিসেবে সর্ব প্রথম চট্টগ্রামে তথা পটিয়ায় আগমন শুরু করেন।

এই সম্মেলনের মূল অভিভাবক হযরত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব ও উদ্যোক্তাদের এখলাসপূর্ণ মেহনত ও শ্রম আল্লাহর কাছে এতই মকবুল হয় যে, পটিয়ার রাহাতআলী উচ্চবিদ্যালয় মাঠের এই সম্মেলন চট্টগ্রামে সর্ববৃহৎ সম্মেলনে পরিণত হয়। এর সাফল্য ও উপকারিতা পুরো চট্টগ্রামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই সম্মেলন থেকে দিকনির্দেশনা পেয়ে এবং এই সম্মেলনের নগদ প্রভাব দেখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এরূপ সম্মেলন করার উদ্যোগী হয়ে উঠেন অনেক আলেম ওলামা ও ধর্মপ্রীয় তরুণ সমাজ। তারা সরাসরি, অনেকে পরোক্ষভাবে এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের কাছে যোগাযোগ করতে থাকেন। একই অবকাঠামোতে সর্বস্থানে সম্মেলন করতে পারার জন্য, এই কাজের মূল অভিভাবক হযরত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব পটিয়ার তৎকালীন সিনিয়র উস্তাদ ও মাসিক আততাওহীদের সম্পাদক হযরতুল আল্লাম হাফেজ মুহাম্মদ আনোয়ার সাহেব (রহঃ)কে সেক্রেটারী মনোনীত করে "ইসলাম প্রচার সংস্থা নামে" একটি সংগঠন করে দেন।এই সংগঠনের অধীনে চট্টগ্রামে থানা ভিত্তিক, ইউনিয়ন ভিত্তিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

অরাজনৈতিকভাবে সাংগঠনিক রূপ দিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কওমী মাদরাসার উদ্যোগে সম্মেলন ও সমাবেশ করার এটিই সর্ব প্রথম ইতিহাস। এর আগে সাংগঠনিক রূপ দিয়ে ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া দূরের কথা কওমী মাদরাসার গন্ডির বাইরে গিয়ে অরাজনৈতিকভাবে সভা-সমাবেশ হতে পারবে এর ভাবনাও কারো অন্তরে ছিল না।

ইসলাম প্রচারের এই আলোকিত ইতিহাস ঐ সময়ই রচিত হয়েছিল যখন দেশের প্রায় এলাকায় কওমী মাদরাসার ছাত্র শিকক্ষদেরকে ওয়াহাবী বলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হত। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে ফতোয়া দিয়ে দেশের জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলে অত্যাচার করা হত। পদে পদে কওমী আলেমদেরকে অপমান ও বেইজ্জত করা হত। কওমী আলেমগণ নববী আদর্শে উজ্জীবিত ছিলেন বিধায় সবর এবং আহে সেহেরগাহী ছিল তাঁদের সর্বোচ্চ সম্বল ও সর্বশেষ হাতিয়ার। যার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের কাজকে এগিয়ে নিতে মগ্ন ছিলেন।

বড় দুঃখের বিষয় ছিল, এহেন নাজুক পরিস্থিতিতেও কোন কোন আলেমের পক্ষ থেকে পটিয়া মাদরাসার এধরনের বিকাশমূখী বিভিন্ন কর্মসূচী ও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বিদআত ইত্যাদি ফতওয়া আসত। যার কারণে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ত। পটিয়া মাদরাসার ইত্তিহাদ বোর্ড, পটিয়া মাদরাসারই নেতৃত্বে গড়ে উঠা বেফাক বোর্ড, মাসিক আত্তাওহীদ, ইসলামী সম্মেলনের নামে এ ধরনের ওয়াজ মাহফিল করা, সেখানে মোনাজাত করা, মাইকে কুরআন তেলাওয়াত সবকিছুই তখন তাদের ভাষায় শরীয়ত অসমর্থিত বা অনর্থক কাজ বলেই বিবেচিত ছিল। এসব কাজ করায় তারা আলজামিয়া পটিয়াকে এক প্রকার বিদআতের লালনকারী বলেই সাব্যস্ত করতে চাইত। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো সেখানকার তৎকালীন মুরুব্বীগণ জামিয়া পটিয়ার বহুমুখী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন না। বরং আশপাশে যারা ছিলো তারা মুরুব্বীগণের সামনে আলজামিয়া পটিয়ার বহুমুখি কর্মকাণ্ডগুলোর এমন ব্যাখ্যা দিতেন যা সরাসরি বিদআত বা শরীয়ত অসমর্থিত বিষয়ের খাতেই পড়ে এবং মুরুব্বীগণ ওয়াজ নসীহতে উক্ত কর্মকাণ্ডের প্রতিপক্ষে মত প্রকাশ করতেন। তা থেকে বুঝা যায় অনৈক্যকে তাজা রাখার জন্য চলমান সময়ের মত সে সময়ও কিছু লোকের দূরভিসন্ধি সক্রিয় ছিলো। যারা বড়দের আশপাশে থেকে তাদের পরস্পরের শ্রদ্ধা-ভক্তি ও সম্প্রীতি নষ্ট করার কাজে ইন্ধন যোগাতো। এ সব নিকট অতীতেরই ইতিহাস।

কতইনা সুন্দর বলেছেন কবি:

دشمنوں کی دشمنی سے ہم شکایت کیا کریں
دوستوں کی دوستی میں جب وفا ملتا نہیں

কিন্তু কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে পটিয়া মাদরাসার মুরুব্বীগণ এবং বর্তমান যুগে মুসলিম উম্মাহর সফল অভিভাবক মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব সকল প্রকার সেবামূলক, কল্যাণমূখী ইসলামী কর্মসূচী অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সফলতার সহিত বাস্তবায়ন করে গেছেন। বৃহত্তর চট্টগ্রামসহ দেশের আরো অনেক স্থানে ইসলাম প্রচার সংস্থার অধীনে সম্মেলন আয়োজন শুরু হয়ে যায়। যার কিছু কিছু নমুনা এখনও বিদ্যমান। এখনও বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচার সংস্থার নামে ইসলামী সম্মেলন হয়ে থাকে। এই গুরুত্বপূর্ণ ধারা অব্যাহত রাখায় আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কওমী মাদরাসার দাওয়াতী প্রোগ্রামকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সম্মেলন আকারে বাস্তবায়ন করার বাস্তব সুফল ও সফলতা সম্পর্কে মূলত পটিয়া মাদরাসার মুরুব্বীগণই অবগত ছিলেন। তাদের দীর্ঘ দিনের এই মেহনতকে আরো বেগবান করতে, মুসলিম উম্মাহের কাছে দাওয়াতী প্রোগ্রামকে আরো ব্যাপক করতে তাদের অন্তরে বিভিন্ন নতুন নতুন উদ্যোগ নাড়া দিত। তাদের মুখে মুখে ছিল চট্টগ্রাম শহরে একটি ব্যাপক আকারে ইসলামী সম্মেলন হওয়া খুবই প্রয়োজন। কারণ তখন চট্টগ্রাম শহরের অবস্থা ছিল খুবই ভয়াবহ। কওমী আলেমদের সংঘবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর কোন স্থান ছিল না। সর্বস্থানে বেদআতী রেজভী ও ভ্রান্তদের দৌরাত্ম ছিল আশংকাজনকভাবে। তাই তারা ভেবেছিলেন যদি চট্টগ্রাম শহরে বড় মাপের একটি সম্মেলন করা হয় এবং তা যদি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে তবে আশা করা যায় চট্টগ্রাম থেকে ভ্রান্ত ও বাতিলদের মুখোশ উন্মোচন করা সম্ভব হবে। গণমানুষ তাদের একচেটিয়া প্রভাব থেকে নিস্কৃতি পাবে, সীরাতে মুস্তাকীমের সেই হারানো পথ ফিরে পাবে। হৃদয়ে এসকল ভাবনা নিয়ে প্রতীক্ষার প্রহর গুনছিলেন জামিয়া পটিয়ার তৎকালীন মহাপরিচালক আলহাজ্ব মাওলানা ইউনুস সাহেব (প্রকাশ হাজীসাহেব হুজুর) রহ. এবং সহকারী মহাপরিচালক হযরত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব প্রমূখ। কারণ তাঁরাই সেসময় এধরনের ইসলামী সম্মেলন, সমাবেশ, ত্রাণ বিতরণসহ বিভিন্ন কল্যাণ ও সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োজিত ও নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন।

এই পরিসরে একদা ভারতের কওমী অঙ্গনের সামাজিক ও সেবামূলক কাজের মূল কর্ণধার, উপমহাদেশের মুসলমানদের যোগ্য ও সফল অভিভাবক আওলাদে রাসূল হযরতুল আল্লাম সৈয়দ মাওলানা আসআদ মাদানী সাহেব রহ. তাঁর নিয়মিত সফরে বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি ইলহামীভাবে পরামর্শ দেন যে, কওমী মাদরাসাসমূহের পক্ষ থেকে অরাজনৈতিকভাবে চট্টগ্রাম শহরে বড় মাপের একটি সম্মেলন হওয়া

আবশ্যক। এই জন্য তিনি পটিয়ার মুরুব্বিবৃন্দ তথা হযরত হাজী সাহেব হুজুর ও মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব এবং আরো কিছু শিক্ষিত ও ব্যবসায়ীসমাজকে আকৃষ্ট করেন। তাঁর পরামর্শের উপর ভিত্তি করে হযরত হাজী সাহেব হুজুর ও মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব চট্টগ্রামের কিছু ব্যবসায়ী বিশেষ করে হাজী আব্দুর রউফ সাহেব এবং কওমী মাদরাসাসমূহের মুহতামিম ও প্রতিনিধিদের নিয়ে বেশ কবার বৈঠকে মিলিত হন। সর্ব শেষ বৈঠকে সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক একটি কমিটি গঠন এবং চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজ ময়দানে ব্যাপকভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানের একটি সম্মেলন আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জামিয়া পটিয়ার মহাপরিচালক হযরত হাজী সাহেব হুজুর (রহঃ)কে সভাপতি এবং জামিয়া পটিয়ার বর্তমান মহাপরিচালক মুফতী আব্দুল হালীম বোখারী সাহেবকে সেক্রেটারী মনোনীত করে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়। মূল দিকনির্দেশনা ও পরামর্শদাতা ছিলেন ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব। এতে জামিয়া ইসলামিয়া জিরির বর্তমান মুহতামিম হযরতুল আল্লাম শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব ও জামিয়া ইসলামিয়া দারুল মাআরিফের মুহতামিম হযরতুল আললাম সুলতান যওক সাহেব প্রমূখও ছিলেন। সে কমিটির অক্লান্ত ত্যাগে সর্বপ্রথম ১৯৮৬ সালে চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক সার্কিট হাউজ ময়দানে সর্ববৃহত গণজমায়েতের মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনের ঐতিহাসিক শুভযাত্রা আরম্ভ হয়। সারা দেশের জন্য এটিই ছিল সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ গনজামায়েত যা খালেস কওমী মাদরাসার পক্ষ থেকে অরাজনৈতিক ভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। দেশ বিদেশের বড় বড় মুরুব্বী এতে আমন্ত্রিত হন এবং যোগদান করেন। কওমী অঙ্গনের বড় বড় পীর মাশায়েখ ও অলীআল্লাহর দোয়ার বরকতে চট্টগ্রামে বাতিল শক্তির অপপ্রচার, ওয়াহাবী বলে উল্লাস, বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখিয়ে কওমী মাদরাসার বিরুদ্ধে আম জনতাকে ক্ষিপ্ত করার অপপ্রয়াস ইত্যাদির মুখোশ কয়েক বছরের মধ্যেই উন্মোচিত হয়। থেমে যায় তাদের মিথ্যা উল্লাস, হৈহোল্লোড় ও দৌরাত্ম।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন নিয়ে কওমী মাদরাসার ছাত্রদের মধ্যে ছিল অভাবনীয় আনন্দ। এত বড় সম্মেলন আয়োজনে প্রচার প্রসারে কওমী মাদরাসার ছাত্ররা ছোট বড় নির্বিশেষে যাকে যে দায়িত্ব দেয়া হত অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে সকল কাজ নিমিশেই সম্পাদন করত। রাত ব্যাপী আনন্দ উল্লাসের মধ্যদিয়ে চট্টগ্রামের আনাচে কানাচে পোষ্টারিং আবার খুব কম সময়ে দাওয়াত পত্র বিতরণ করত তারা।

এ সময় যারা মাইকিং করত তাদের জানা আছে, কয়বার তাদের কাছ থেকে বাতিল পন্থীরা মাইক কেড়ে নিয়ে গেছে। কতবার সঙ্গী-সাথীদের তারা অপহরণ করে মার-ধর করেছে। বিভিন্নভাবে চালানো হতো তাদের উপর নির্যাতন ও অত্যাচারের স্টীম রোলার। হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ মাসরুর ফরীদপুরী সাহেব আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রারম্ভ থেকে দফতর সম্পাদকসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাঁর কাছে এসব তিক্ত ইতিহাস ভালভাবেই জানা থাকবে।

দু'বছর পর সম্মেলন কমিটির সেক্রেটারী মনোনীত হন ফক্বীহুল মিললাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব। পূর্ব থেকে তিনি কর্ণধার হিসেবে সম্মেলনের কাজ আঞ্জাম দিয়ে এসেছেন। সরাসরি সেক্রেটারীর দায়িত্ব তাঁর কাছে এলে তিনি সম্মেলনের উন্নতি এবং সম্মেলনকে খালেস কওমী মাদরাসার সম্মেলন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কিছু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেন।

মাদরাসার গণ্ডিতে কওমী মাদরাসা সমূহের ঐক্য ও সমন্বিত আদর্শ বাতিলপন্থীদের জন্য গাত্রদাহের কারণ ছিল বহু আগে থেকে। আবার সম্মেলনের মাধ্যমে বিশাল শোডাউন, তাদের বাতিল আকীদার মুখোশ উন্মোচন, গণমানুষের সামনে সঠিক আকিদা তুলে ধরার মাধ্যমে গণ সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি সফল বাস্তবতা বাতিলপন্থীদের মনোজ্বালা আরো বাড়িয়ে দেয়। এক পর্যায়ে কওমী উলামাদের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ফাটল ধরে বেশ কটি দলে পরিণত হয় কওমী রাজনীতি। তখন বাতিল শক্তি সামান্য ঘুরে দাড়ায়। শতধা বিভক্ত দলগুলো নিয়ে উপহাস করতে থাকে। পরস্পর আদর্শিক অনৈক্য মিডিয়াতেও প্রচার পেতে থাকে।এমতাবস্থায় সম্মেলন কমিটিও আপন দলগুলোর পক্ষ

থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মূখীন হয়। কমিটির অভ্যন্তরেও নেতাদের পক্ষ থেকে রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চাপ প্রয়োগ হতে থাকে। তখন হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত সাহেব আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে আপন ঘরানার রাজনীতি থেকেও মুক্ত করার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য হন। এক বাতিল পন্থী তথাকথিত ইসলামী সংগঠনের মুফাসসিরে কুরআন তাদের তাফসীর মাহফিলে এই সম্মেলনকে মৌসুমী কোকিল বলেও আখ্যায়িত করতেন। এরা সম্মেলনের ধারাবাহিকতা ও নিয়মতান্ত্রিকতা ক্ষুন্ন করার অপপ্রয়াসেও মরিয়া হয়ে কাজ করছিল। এর ভিতর কিছু লোক ইসলামী জিহাদের তথাকথিত কর্ণধার পরিচয় দিয়েও হযরত ফকীহুল মিললাত সাহেবকে হুমকি ধমকি দেয়।

কিন্তু যুগের সাহসী পুরুষ হক্ব ও দেওবন্দিয়তের পতাকাবাহী অকোতভয় সিপাহসালার ফকীহুল মিল্লাত হযরত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব কোন হুমকি ধমকির তোয়াক্কা না করে যে কোন অপ্রীতিকর ও ভীতিকর পরিস্থিতির মোকাবেলা করে সম্মেলনের কাজ নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবেই এগিয়ে নিয়ে গেছেন। হাজার বাঁধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ধারাবাহিকতা এখন ২৭ বছরে উপনীত হয়েছে। সরকার গেছে, সরকার এসেছে, ক্ষমতার হাত অনেকবার পাল্টেছে, দেশে ভয়াবহ আন্দোলন, বিপ্লব, সামরিক শাসন, কার্ফিউ, জরুরী অবস্থা, হরতাল, অসহযোগ এমনকি অনাকাংখিত ফখরুদ্দীন সরকারের মত সরকারও এসেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অগ্রযাত্রায় কেউ চিড় ধরাতে পারে নি পারবেও না ইনশাআল্লাহ। যারা এই সম্মেলনকে সিজনাল কোকিল আখ্যায়িত করে উপহাস করত হায়! আজ তারা কোথায়? মনে হচ্ছে তারা চামচিকার মত সূর্যের আলোর ভয়ে অন্ধকারের সাথী। তাদের দম্ভোক্তি আজ বিস্মৃত ইতিহাস।

এক সময় মজলূমিয়াতের শেষ প্রান্তে পৌছে হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত সাহেব সম্মেলন কমিটির কাছে আপন দায়িত্ব পালনে অপারগতা জানালে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিগণ অশ্রুসিক্ত হন। তাঁর অপারগতাকে কেউ কবুল না করে বিষয়টি সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষক আওলাদে রাসূল সৈয়দ আসআদ মাদানী রহ. পর্যন্ত পৌছান। তা শুনে তিনি মনে মনে নারাজ হন এবং হযরত ফকীহুল মিললাত সাহেবকে কাঁছে ডেকে তা-হায়াত সম্মেলনের হাল না ছাড়ার জন্য উপদেশ দেন এবং এর উপর রীতিমত হাত ধরে ওয়াদা নেন।

সম্মেলন কমিটির সভাপতি আলজামিয়া পটিয়ার মহাপরিচালক হযরত হাজী ইউনুস সাহেব ইন্তিকাল করে জান্নাতবাসী হয়ে গেলে হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত সাহেব সম্মেলনের ধারাবাহিকতায় কোন প্রকার প্রভাব না পড়ার জন্য কমিটির সিদ্ধান্ত ও স্বীকৃতির মাধ্যমে দারুল উলূম মইনুল ইসলাম হাটহাজারীর মহাপরিচালক হযরতুল আল্লাম মাওলানা আহমদ শফী সাহেব (দাঃ বাঃ)কে কমিটির সভাপতি মনোনীত করেন। তার পর থেকে এই পর্যন্ত যে টুকু দেখা গেছে, মাননীয় সভাপতি সাহেব দা:বা:কে সম্মেলনের কাজে কিঞ্চিত মাথা ঘামাতে হয়নি। বরং যাবতীয় কাজ হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত সাহেব তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে একাই আঞ্জাম দিয়ে এসেছেন। বড় আশ্চার্যের বিষয় হলো তাঁর মৌনতার কারণে হযরত মুফতী সাহেব কোন প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এমন নজিরও নেই। যা তাঁর এখলাস ও উদারতার উজ্জল দৃষ্টান্ত।

চট্টগ্রামের আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনের সফলতা, নিয়মতান্ত্রিকতা, ধারাবাহিকতা এবং যোগ্য নেতৃত্ব দেখে সারা দেশের কওমী আলেমগণের অন্তরে এই সম্মেলনের ভবিষ্যৎ আলোর বিকিরণ হিসেবে উকিঁ দেয়। যার ফলে দেশের প্রায় স্থান হতে হযরত ফকীহুল মিল্লাত সাহেবের কাছে নিজেদের এলাকায় আন্তর্জাতিক মানের সম্মেলন করার জন্য আবেদন আসতে থাকে। হযরত মুফতী সাহেব হুজুর কিছু শর্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন এলাকায় সম্মেলন করার অনুমতি দেন। প্রত্যেক এলাকার সম্মেলনগুলো অবকাঠামোগত মিল থাকার জন্য সম্মেলন কমিটিকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার রূপ দেন এবং একটি রেজিষ্টার্ড সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলেন। এরই ফলশ্রুতিতে বর্তমানে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশের তত্তাবধানে মাস ব্যাপী সারা দেশের বৃহত্তর জেলা শহরসমূহে আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে কওমী মাদরাসার উদ্যোগে। বড় সুখের বিষয় হল সম্মেলনগুলোর মধ্যে এমন এমন সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হচ্ছে যেগুলোতে লাখ লাখ লোকের জমায়েত হয়ে থাকে। বিভিন্ন জেলায়তো আম জনতা রীতিমত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্য সারা বছর প্রতীক্ষার প্রহর গুনেন।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন ককসবাজারেঃ
আন্তর্জাতিক সম্মেলন চট্টগ্রামে সফলভাবে কয়েক বছর অনুষ্ঠিত হওয়ার পর কক্সবাজারের ওলামায়ে কেরাম পর্যটন নগরী কক্সবাজারে সম্মেলন করার জন্য হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত সাহেবের কাছে তাদের গভীর আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। হযরত ওয়ালা বেশ কিছু শর্ত আরোপ করে তাদেরকে সম্মেলন করার জন্য অনুমোদন প্রদান করেনএবং ১৯৮৯ইংতে ককসবাজার ঐতিহাসিক পাবলিক হল ময়দানে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ক্রমান্বয়ে সম্মেলনে লোকসমাগম আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে পৌরপ্রিপ্রেটরী উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে এই সম্মেলন উক্ত এলাকার সর্ববৃহৎ জনসমাগমই বটে।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন নোয়াখালীতেঃ
চট্টগ্রামের আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনের এহেন আশাতীত সফলতা, উপকারিতা দেখে নোয়াখালী জেলার বড় বড় আলেম ওলামার অন্তরে এক প্রচণ্ড জযবা উঁকি দেয়। তাঁদের চিন্তায় আসে, আমরা বৃহত্তর নোয়াখালীর আলেমগণ কওমী মাদরাসা ভিত্তিক একটি ঐক্য মঞ্চ গড়ে তুলে এধরনের বৃহৎ সম্মেলন করতে পারলে দেশের মুসলমানদের হেদায়াতের পথ সুগম হতো। হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত দা. বা. জামিয়া ইসলামিয়া মাইজদীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নোয়াখালীতে তাঁর যাতায়াত ছিল। ১৯৯৪ ইং এর মাঝামাঝি সময়ে নোয়াখালী জেলার কিছু মান্যগণ্য ওলামায়ে কেরাম নোয়াখালীতে ওলামায়ে কেরামের একটি ঐক্য মঞ্চ গড়ে তুলা এবং মাঠে ময়দানে বড় আকারের সম্মেলন করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত সাহেবের কাছে পরামর্শ করেন। এক্ষেত্রে তাঁদের উৎসাহ উদ্দীপনা ও আন্তরিক চাহিদা প্রত্যক্ষ করে তিনি সফল দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। সে মোতাবেক ১০/০৮/১৯৯৪ইং তে জামিয়া ইসলামিয়া মাইজদীতে তৎকালীন আলজামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ার স্বনামধন্য মুহাদ্দিছ আল্লামা সিদ্দীক উল্লাহ সাহেবের সভাপতিত্বে একটি পরামর্শ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয় ১৭/০৮/১৯৯৪ইং তারিখে নোয়াখালী জেলার উলামায়ে কেরামকে নিয়ে একটি উলামা মাশায়েখ সম্মেলন করা হবে। সে মোতাবেক উক্ত তারিখে জামিয়া ইসলামিয়া মাইজদীতে একটি উলামা মাশায়েখ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন হযরত ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব দা. বা.। এই সম্মেলনের ভিত্তিতে প্রথমে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার উলামাদের একটি বৃহত্তর ঐক্য মঞ্চ গড়ে উঠে। তাদের আগ্রহে ২৪/১২/১৯৯৪ইংতে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তখন হযরত মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ সাহেব (রহ.) কে সভাপতি এবং জামিয়া ইসলামিয়া মাইজদীর মুহতামিম মাওলানা আজীজুল্লাহ নওয়াব সাহেবকে সেক্রেটারী করে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা নোয়াখালী জেলা শাখা গঠন করা হয়। সে থেকে নোয়াখালীতে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনের ধারা আরম্ভ হয়। বর্তমানে এই সম্মেলন বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার আলেম ওলামা এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের একটি সর্ববৃহৎ জনসমাগমে পরিণত হয়েছে। এই সম্মেলনের প্রভাব এখন পুরো নোয়াখালীতেই ছড়িয়ে পড়েছে।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন ফেনীতেঃ
চট্টগ্রামের আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে উৎসাহিত হয়ে ফেনীর উলামায়ে কেরামের মধ্যেও একসময় অনুভূতি সৃষ্টি হয় যে, চট্টগ্রামের মত সেখানেও আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া খুবই প্রয়োজন। এ জন্য তাঁরা হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত দা. বা. এর কাছে পরামর্শ করলে তিনি সম্মেলন সংস্থার বিভিন্ন শর্তাদি সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন। একাজে সর্বপ্রথম উদ্যোক্তা হলেন ভাদাদিয়া নুরুল উলূম মাদরাসা ফেনীর মুহতামিম মাওলানা হাফেজ খলীলুর রহমান সাহেব। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয় ফেনী উলামা বাজার মাদরাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা আব্দুল হালীম সাহেব রহ. এবং সেক্রেটারী মনোনীত করা হয় হযরত মাওলানা মুফতী হবীবুর রহমান সাহেবকে। ফেনীর সর্বস্তরের ওলামায়েকেরামের অংশগ্রহণে সর্বপ্রথম ১৯৯৩ সনে ফেনীর মিযান ময়দানে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক বছর অভাবনীয় সফলতার মাধ্যমে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকলে বিভিন্ন বাতিল দল নিজেদের অস্বচ্ছ মতাদর্শ ও ধর্মের আড়ালে নিজেদের অপকর্মগুলোর জন্য এই সম্মেলনকে হুমকি মনে করে। সে কারণে তারা মীযান ময়দানের সম্মেলন নিয়ে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। এদিকে

বাতিল দলগুলোর এহেন অকল্পনীয় আচরণ দেখে ফেনীর উলামায়েকেরাম নিজেদের ঐক্যকে সুদৃঢ় করণ এবং সম্মেলনকে অন্যত্র স্থানান্তরের চিন্তা করেন। এই চিন্তাধারার ভিত্তিতে ফেনীর ওলামায়ে কেরাম তানযীমুল মাদারিসিল কওমিয়্যা ফেনী নামে একটি কওমী মাদরাসা ভিত্তিক অরাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯৬ সন হতে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার তত্বাবধানে তানযীমুল মাদারিস আল কাওমিয়্যার উদ্যোগেই আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। তবে বিভিন্ন বাতিল সম্প্রদায়ের অপরিনামদর্শী বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে এই সম্মেলন কয়েকটি মাঠে স্থানান্তরিত হয়। যে মাঠেই হোক না কেন এই সম্মেলন অত্যন্ত সুচারু রূপে অকল্পনীয় সফলতার মাধ্যমেই প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানেও সম্মেলনের মাধ্যমে উলামায়ে কেরামের যে ঐক্যমঞ্চ গড়ে উঠেছে তা ফেনীর ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। আবার এই সম্মেলন ফেনীর ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অন্তরে জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছে এবং সকল মুসলমানদের অন্তর কেড়ে নিয়েছে।

আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন বৃহত্তর উত্তর বঙ্গেঃ

যদি লোক সমাগমের আধিক্যতার দিক থেকে আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে বিবেচনা করা হয় তবে বলতেই হয় এ ক্ষেত্রে উত্তর বঙ্গের সম্মেলন গুলো অগ্রগণ্য। ১৯৯৮ ইংরেজী থেকে আরম্ভ হয় সিরাজগঞ্জের আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন। বর্তমানে উক্ত সম্মেলনে লাখো মুসলমানের ভীড় পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯৪ইং তে রংপুর, একই বছর সৈয়দপুর এবং ১৯৯৬ইং সনে দিনাজপুরে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন আরম্ভ হয়। বর্তমানে উক্ত এলাকা সমূহে আন্তর্জাতিক সম্মেলন স্মরণ কালের লোকসমাগমে পরিণত হয়েছে।

তেমনিভাবে ১৯৯০ সালে থেকে ফরিদপুরে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ধারা আরম্ভ হয়। মাওলানা আব্দুল্লাহ মসরুর ফরীদপুরী ও মাওলানা মুফতী আব্দুল কাদের সাহেব রহ. এতে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখেন। কুমিল্লায় আরম্ভ হয়েছে ১৯৮৮ইং সন থেকে।

২০১০ সালে পাবনায়, একই বছর ভোলাতেও আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন আরম্ভ হয়েছে। ১৯৮৮ সাল থেকে ঢাকার মিরপুর, পল্টন, লালবাগ, সাত রাওজা, বসুন্ধরা, রিভারভিউ কেরাণীগঞ্জসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

পূণ্য ভূমি সিলেটে ২০০৮ইংতে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন আরম্ভ হয়। বর্তমানে এই সম্মেলন সিলেটের অনন্য একটি আদর্শ সম্মেলন হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছে।

প্রতিবছরই নতুন নতুন জেলা থেকে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের অনুমোদনের জন্য হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত সাহেব দা. বা. এর কাছে আবেদন আসতে থাকে। কিন্তু কাজের পরিধি কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সবগুলো আবেদন মঞ্জুর করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। তথাপী স্থান ও পরিবেশ-পরিস্থিতি ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে প্রতিবছর দু' একটি সম্মেলনের অনুমোদন দিয়ে থাকেন। এবছরও দু'টি নতুন এলাকায় সম্মেলন অনুমোদন করেছেন। তথা বি-বাড়িয়া ও বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার হোমনা। আশা করা হচ্ছে এই সম্মেলন গুলোও অত্যন্ত সফলভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

হযরত ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব প্রচারবিমুখ পীর মাশায়েখদের অন্যতম। তিনি যে কোন প্রচার মাধ্যম ও মিডিয়া থেকে ঊর্ধ্বে থেকে কাজ করতে আগ্রহী। যার কারণে এত বিশাল বিশাল সম্মেলনেও তিনি কোন মিডিয়াকে দাওয়াত দেন না। স্বতঃস্ফুর্তভাবে কোন সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার বা মিডিয়াকর্মী সম্মেলনসমূহে ভিডিও বা ছবির পোজ নিতে গেলে তাদের উপর অগ্নিসর্মা হয়ে উঠেন তিনি। ছবি ভিডিও যে ইসলামী শরীয়তে হারাম সেটার উপর তিনি অটল অবিচল থেকেই কাজ চালিয়ে গেছেন এবং যাচ্ছেন। আসলে আল্লাহর রাস্তায় আন্তরিকভাবে যে কাজ হবে তা প্রচার বিমুখ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ ইসলাম কায়েমের নামে হারাম কাজের আশ্রয় নিলে ইসলাম কায়েম তো দূরের কথা ইসলাম বিধ্বংসী হওয়া বিচিত্র নয়। আল্লাহ পাকের শুকর এমন প্রচার বিমুখিতা সত্বেও হযরত ফক্বীহুল মিল্লাতের কাজ কর্ম ও দাওয়াতী কর্মসূচীগুলো এতই প্রচার প্রসার লাভ করে যা রীতিমত হতবাক হওয়ার মত।

চট্টগ্রামের আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনকে তিনি পোষ্টারিং,

হ্যান্ডবিল বিতরণ ও মাইকিংএর মাধ্যমে প্রচার করার ঊর্ধ্বে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাবলীগী ইজতিমার মতো এতেও ঐসমস্ত ছোট খাট কাজ করা না হোক। বরং মানুষের মৌখিক প্রচারের মাধ্যমে সফল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরিবেশ গড়ে উঠুক। কারণ তিনি ঢাকাতে যে সকল প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় ব্রতী অর্জন করেছেন, যে প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে অনন্য শিক্ষা কেন্দ্র হওয়ার দাবী রাখে সেগুলো সম্পূর্ণ প্রচারপত্রহীনভাবেই এই পর্যন্ত পৌছেছে। পোষ্টার হ্যান্ডবিল তো দূরের কথা পত্রিকায় কোন এ্যাড, প্রেস রিলিজ, ক্রোড়পত্র ইত্যাদি কিছুর আশ্রয় না নেয়া সত্বেও বসুন্ধরার মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনমিক্স বাংলাদেশ, রিভার ভিউর জামিয়াতুল আবরারসহ আরো বেশ কিছু বিদ্যাপীঠ এবং উচ্চ শিক্ষার অনন্য কেন্দ্র হিসেবে রাজধানীর বুকে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এমনকি সেসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় বৃহৎ ব্যায় নির্বাহে গণমানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে চাঁদা কালেকশনেরও সিষ্টেম রাখা হয় নি। বরং হযরত ফকীহুল মিল্লাত সাহেবের ইখলাস ও সাহসী দাবী হলো যে কোন কওমী মাদরাসা; যদি সেখানে সঠিক নিয়মে লেখা পড়া চলে এবং মুরুব্বীদের মূল আদর্শের উপর সম্পূর্ণরূপে অটল থাকে তবে আললাহ পাক তাঁর গায়েবী খাজানা থেকে মাদরাসা গুলোর ব্যায় নির্বাহের ব্যবস্থা করে দিবেন। এই আদর্শে অটল অবিচল থেকেই তিনি সকল দ্বীনি কাজ আঞ্জাম দেয়ার পক্ষে। বাংলাদেশে এই আদর্শের প্রবর্তন তাঁরই মাধ্যমে হয়েছে। যা এখনও অনেক আলেম ওলামার কাছে পৌরাণিক কাহিনীর মতই। হয়ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোকেও সেই আদলে তিনি পরিচালনা করতে খুবই আগ্রহী। কিন্তু পরিবেশ ও প্রতিবেশের স্রোতধারা তিনি কখন কিভাবে রুখে দিতে সক্ষম হবেন তা আল্লাহই ভাল জানেন।

হযরত মুফতী সাহেবের ত্যাগের ফসল দেশ ব্যাপী আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনসমূহ মুসলিম উম্মাহকে হক্ব বাতিল পার্থক্য করণ, ইসলামের সঠিক আক্বীদা বিশ্বাসের প্রতি উদ্বুদ্ধ হওয়া, বাতিল দলসমূহের ভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন করা ইত্যাদি দ্বীনি মৌলিক বিষয়ের দিশা দিতে সক্ষম হয়েছে। এর মাধ্যমে বাতিলদের ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনাগুলোর মুখোশ উন্মোচিত হচ্ছে। প্রকৃত হেদায়াতের পথে মানুষ ধাবিত হচ্ছে। খোলা মাঠে গোল করা বা ছক্কা মারার যে পরিবেশ পূর্ব থেকে বাতিল দলসমূহ সৃষ্টি করে রেখে ছিল তা রোধ হয়ে যাচ্ছে। এককথায় বলতে গেলে অরাজনৈতিক খালেস কওমী মদরাসাভিত্তিক এই প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে মুসলিম উম্মাহর যে উপকার হচ্ছে বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক হাজার প্রোগ্রামেও জনসাধারণের এরূপ উপকার হয় নি।

চট্টগ্রামের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সফলতা ও নগদ যে উপকার আমরা স্বচক্ষে দেখেছি তা হলো এখানে কওমী আলেমদের ওয়াহাবী ইত্যাদি বলে যে ঠাট্টা করা হতো, টুপি ছিনিয়ে নিয়ে আলেমদের যেভাবে অপমান করা হতো, সম্মেলন বা যে কোন প্রোগ্রামের মাইকিংএ মাইক ছিনিয়ে নেওয়া, স্বেচ্ছাসেবকদের অপহরণ করা ইত্যাদি জুলুম অত্যাচার এখন শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে। যে সকল এলাকায় পূর্বে কোন কওমী আলেম কোন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করতে পারেনি সেরূপ এলাকায়ও এখন নিয়মিত ইসলামী সম্মেলন, সমাবেশ ও ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হচেছ। বলা যায় বাতিলপন্থীদের দীর্ঘ দিনের পরিবেষ্টিত শৃংখল ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে এই সম্মেলনের উসিলায়।

আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনের মাধ্যমে চট্টগ্রামবাসী উপমহাদেশের বিশ্বখ্যাত আলেমদের সুহবত ও সংশ্রবে ধন্য হয়েছে।

উপমহাদেশের মুসলিম উম্মাহর সফল ও মুখলেস অভিভাবক আওলাদে রসূল হযরত মাওলানা সৈয়দ আসআদ মাদানী রহ. চট্টগ্রামে এরূপ একটি বড় মাপের সম্মেলন করার পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং বার্ধক্য জনিত কারণে অস্বাভাবিক দূর্বল হয়ে যাওয়ার পরও মুসলিম উম্মাহর দাওয়াতের খাতিরে তিনি প্রতিবছর সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে রূহানী বয়ান দ্বারা হাজার হাজার মুসলমানের অন্তরকে আলোকিত করেছেন। বাংলাদেশে হযরতের আগমন এবং বিভিন্ন দ্বীনি কাজে এদেশের আলেম ওলামাকে আকৃষ্ট করা ইত্যাদির কারণে কিছু বাতিল জামাতের গাত্রদাহ সৃষ্টি হতো। এই শ্রেণীর পক্ষ থেকে এদেশের পত্রিকায় তাঁর সমালোচনামূলক

অনেক প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রচার করা হয়েছে। অথচ উপমহাদেশে আর্তমানবতার সেবায় হযরতের যে ব্যাপক ও বহুমুখী অবদান তার কয়েক লক্ষ গুণের একভাগ অবদানও ঐ সব বাতিল শ্রেণীর নেই।

আওলাদে রসূল হযরতুল আল্লাম সৈয়দ আব্দুল মজীদ নদীম সাহেব। যিনি পাকিস্তানে কওমী ও ইসলামী রাজনীতির অঙ্গনে বর্তমান সময়ের কয়েকজন মুরুব্বীদের অন্যতম। দ্বীনী দাওয়াতের খাতিরে কওমী আলেম ওলামার মুহাব্বত এবং বিশেষ করে হযরত ফকীহুল মিল্লাতের আহবানে সাড়া দিতে শারীরিক অসুস্থতার যাতনা সয়েও প্রতিবছর বাংলাদেশ সফর করেন। দেশ বিদেশের অগনিত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি প্রতি বছর মাসের অধিক সময় আমাদের জন্য নিবেদন করেন। পাকিস্তানের সামাজিক যে কোন কল্যাণমূখী কাজ কর্মে এবং সম্মিলিত ইসলামী শক্তির সমন্বয়ের ক্ষেত্রে তিনি কতবড় ব্যক্তিত্ব তা আমরা এখানে বসে আঁচ করতে পারব না। দুনিয়ার বুকে তিনি যে পরিমাণ দেশ সফর করেছেন এমন ব্যক্তি হয়ত হাতে গুনাই থাকবে। ইন্টারনেট সূত্রে জানা যায়, ইউরোপের এক গির্জায় তাঁর সুললিত কণ্ঠে কেরাত শুনে দু'হাজারের অধিক খৃষ্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এক মঞ্চে। এরূপ মহান ব্যক্তিত্বের সংশ্রব ও সাহচর্য যে, প্রতিবছর আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উসীলায় বাংলাদেশের মানুষ পেয়ে থাকেন এর চাইতে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে। তিনি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এসে শুধু ওয়াজ করে যান তা নয় বরং সম্মেলনের ধারাবাহিকতা রক্ষা, বিভিন্ন এলাকায় আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ দূরীকরণসহ বহুবিদ অবদান রাখেন তার সফরকালীন সময়ে।

বিশ্বখ্যাত আলেমে দ্বীন, ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্থপতি হযরতুল আল্লাম মুফতী মুহাম্মদ তকী উছমানী (দা:বা:)এর সংসর্গেও ধন্য হয়েছেন চট্টগ্রামবাসী আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনের মাধ্যমে। হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুফতী আবুল কাসেম নূমানী, মুহতামিম দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত, আওলাদে রাসূল হযরতুল আল্লাম আরশাদ মাদানী ভারত, দেওবন্দের শায়খুল হাদীছ হযরতুল আল্লাম আব্দুল হক্ব আজমী ভারত, কায়েদে মিল্লাত হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান, পাকিস্তান, হযরতুল আল্লাম সালেম কাসেমী ভারত, হযরতুল আল্লাম আনযার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) ভারত, মুজাহিদে মিল্লাত হযরতুল আল্লাম শহীদ জিয়াউর রহমান ফারুকী (রহ.) পাকিস্তান, শায়খ জামাল উদ্দীন শায়রওয়ান সৌদী আরব, শায়খ মুহাম্মদ হোসাইন সালামা মদীনা শরীফ, হযরতুল আল্লাম মাওলানা আব্দুল আলীম ফারুকী সদস্য মজলিসে শূরা দারুল উলূম দেওবন্দ ভারত, আওলাদে রাসূল হযরত মাহমুদ আসআদ মাদানী (মেম্বার রাজ্যসভা ভারত), আওলাদে রসূল হযরতুল আল্লাম সৈয়দ আব্দুর রশীদ আরশাদ পাকিস্তান, বিশিষ্ট গ্রন্থকার হযরত মাওলানা মুফতী জমীল আহমদ, দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত, হযরতুল আল্লাম ড. খালেদ মাহমূদ সাহেব ইউ.কে প্রমূখের ন্যায় যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ওলামা, পীর-মাশায়েখ ও আওলাদে রাসূলগণের সাহচর্য ও সংসর্গ অর্জন করে তাদের নূরানী ও মুক্তা ঝরা ওয়াজ নসীহতে ধন্য হয়েছেন চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানগণ আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনসমূহের মাধ্যমে। এ কারণে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রতি গনমানুষের মুহাব্বত আশ্চর্য হওয়ার মত। বাংলা দেশের প্রায় জেলা থেকে এপর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন করার আবেদন তো এসেছেই থানা পর্যায়ে তা অনুষ্ঠানের জন্য অনেকে আবেগী হয়ে আছেন। কিন্তু হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত সম্মেলন সংস্থার শর্ত স্বাপেক্ষে যাদেরকে পেয়েছেন তাদেরকেই অনুমতি দিয়েছেন।

উপসংহার:

আন্তর্জাতিক সম্মেলনের এই আলোকিত সুদীর্ঘ ২৭ বছরের ইতিহাস খুবই হিম শীতল সুখময় আবেশে তৈরী হয়নি। আল্লাহ পাক দ্বীনের জন্য মানুষের ত্যাগ কামনা করেন। যুগের বড় বড় পীর মাশায়েখগণ আল্লাহর ওয়াস্তে ত্যাগের শেষ অংশটুকু দিয়ে হলেও এই দ্বীনি কাজকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। আকাবিরদের অক্লান্ত শ্রমের সাগর পথে হাটি হাটি পা পা করে আসা এ আমানত আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে লালন করতে হবে। আমাদের কোন আচরণে যেন এই দ্বীনি কাজের পক্ষ থেকে মাজলূমিয়াতের আহজারী শুনতে না হয়। এই কামনায়।

(আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, অবদান অবলম্বনে।)

গ্রন্থনায়: রিজওয়ান জমীরাবাদী

স্মরণ

যার মোবারক নামে এই প্রকাশনা :

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হারদূয়ী (রহ.)

মুফতী উমর ফারুক

হযরত ওয়ালা হারদূয়ী হক্কী রহ.। যিনি ছিলেন শারিরীক অনন্য সৌন্দর্যের মুর্তপ্রতিক, নবীপ্রেমে আসক্ত তথা ফেদায়ে সুন্নাত, আরেফ বিল্লাহ, শায়খে তরীকত, আকাবের ও আসলাফের প্রিয়পাত্র ও আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব, হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত আশরাফুল উলামা হযরতে আকদস মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর সর্বশেষ খলীফা ও হিদায়তের এমন এক আলোকময় উজ্জল নক্ষত্র যার আলোতে ভারতবর্ষসহ আলোকিত হয়েছিল গোটা মুসলিম জাহান। যার মধ্যে সত্যিকার অর্থে প্রস্ফুটিত ছিল তাঁর শায়খ থানভী রহ. এর হাকীমুল উম্মত ও মুজাদ্দিদে মিল্লাত হওয়ার বাস্তব চরিত্র। তিনি তাঁর পিতামহ ফানা ফিররাসূল (সা) হযরতে আকদস শাহ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এর বংশীয় ও আধ্যাত্মিকতার যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন। যিনি নকশবন্দিয়া সিলসিলার অগ্রপ্রতিক খাজা বাকি বিল্লাহ রহ. এর মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার জগতের উন্নতি সাধন করেছিলেন। যদ্দরুন মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর মধ্যে এমন গুনাবলী ও কামালাত দান করেছিলেন যা ছিল সত্যিই ঈর্ষণীয় এবং প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা) এর সুন্নাত ও আদর্শের উপর এমন আশেক ও অবিচল ছিলেন যার ফলে তাঁর পরিচিতিই ছিল মুহিউস্‌সুন্নাহ। যার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার মধ্যে দান করেছিলেন শানে মাহবুবিয়্যাত তথা আকর্ষণ। যে কোন ব্যক্তি তাঁকে কাছে থেকে এক বার দেখলে তাঁর উপর আশেক ও আসক্ত হয়ে যেতেন। সাথে সাথে তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল মাতৃত্বসূলভ দয়ার পাশাপাশি পিতৃত্বসূলভ শুধরানোর জযবা। তাইতো তিনি সদাসর্বদা সযত্নে ইসলাহ ও তারবিয়াত দিতেন, যখনই কারো মধ্যে সুন্নাত পরিপন্থী নগণ্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হতো।

জন্ম ও বংশ : মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ. ভারতের উত্তর প্রদেশের হারদূয়ী শহরে ১৩৩৯ হিজরী মোতাবেক ২০শে ডিসেম্বর ১৯২০ইংরেজী সনে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা হযরত মৌলভী মাহমুদুল হক রহ.। তিনি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর মাজাযে সোহবত ও খলীফা ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এর বংশধর ছিলেন তিনি।

শিক্ষা জীবন : স্বীয় পিতা হযরত মৌলভী মাহমুদুল হক সাহেব রহ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হারদূয়ী আঞ্জুমানে ইসলামী মাদরাসায় আল্লামা আবরারুল হক রহ. প্রাথমিক দ্বীনী শিক্ষা লাভ করেন। দারুল উলূম দেওবন্দের মুহাদ্দিস জন্মগত অলী হিসেবে স্বীকৃত বিখ্যাত বুজুর্গ হযরত আল্লামা সৈয়দ আসগর হুসাইন মিয়া সাহেব রহ. তাঁর প্রথম সবক প্রদান করেন। আল্লামা শাহ আবরারুল হক্ব রহ. প্রাথমিক ও উচ্চতর দ্বীনী শিক্ষা লাভের জন্য ১৩৪৯ হিজরী সনে মাযাহিরে উলূম সাহারানপুর মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে নাহু, সরফ, আরবী সাহিত্য, মানতিক, ফালসাফা, ফিক্‌হ, উসূলে ফিক্‌হ, বালাগাত, হাদীস, তাফসীর প্রভৃতি বিষয়ে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ১৩৫৬ হিজরী সনে তিনি দাওরায়ে হাদীসের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি উসূলে হাদীস অধ্যয়ন করেন। এরপর দুই বছর "তাকমীলে ফুনূন" এর উপর পড়াশোনা সমাপ্ত করেন। এই দুই বছরে তাফসীরে মাদারীকে সিরাজী, তাসরীহ, উকলিদাস, উরুজুল মিফতাহ, হামাসা, খুলাসাতুল হিসাব, মুসাল্লামুস সাবুত, সদরা, তাওজীহ প্রভৃতি কিতাব শিক্ষা লাভ করেন। তিনি শায়খুল কুররা হযরত মাওলানা কারী আব্দুল খালেক রহ. এর কাছে তাজবীদের কিতাবাদী অধ্যয়ন করে তাজবীদ বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

সাহারানপূর মাযাহেরে উলূম মাদরাসায় শায়খুল হাদীস হযরত

মাওলানা হাফেজ যাকারিয়া রহ. এর কাছে তিনি বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড শিক্ষা লাভ করেন। হযরত আল্লামা আব্দুল লতীফ রহ. এর নিকট তিনি বুখারী শরীফ এর ২য় খণ্ড শিক্ষা লাভ করেন। হযরত মাওলানা মনযুর আহমদ রহ. এর কাছে মুসলিম শরীফ ও নাসায়ী শরীফ শিক্ষা লাভ করেন। হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান কামেলপুরী রহ. এর কাছে তিনি তিরমিযী শরীফ ও তাহাবী শরীফ শিক্ষা লাভ করেন।

হযরত মাওলানা আবরারুল হক সাহেব হারদূয়ী রহ. এর প্রিয় উস্তাদগণের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন ফকীহুল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতী মাহমূদ হাসান গঙ্গুহী রহ.। তিনি প্রথমে সাহারানপুর মাযাহিরে উলূম, অত:পর দারুল উলূম দেওবন্দের মুহাদ্দিস ও মুফতী এবং শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা হাফেজ যাকারিয়া সাহারানপুরী রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন। হযরত ওয়ালা হারদূয়ী রহ. তাকে নিজের মুরব্বী হিসেবে গ্রহণ করেন। হাকীমুল উম্মাত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর ইন্তিকালের পর হযরত ওয়ালা হারদূয়ী রহ. প্রথমে হযরত থানভী রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল গণী ফুলপুরী রহ. কে মুরব্বী হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর আরিফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ রহ.কে, তাঁরও ইন্তিকালের পর হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ সাহেব গাঙ্গুহী রহ.কে নিজের মুরব্বী হিসেবে গ্রহণ করেন। নিজে হযরত থানবী রহ. এর খলীফা হওয়া সত্বেও যে কোন একজন বুজুর্গকে মুরব্বী হিসেবে মেনে চলতেন। এটা তাঁর জীবনের এক অনন্য বৈশিষ্ট।

অধ্যাপনা: শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর হযরত ওয়ালা হারদূয়ী রহ. মাযাহেরে উলূম সাহারানপুর মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উস্তাদগনের তত্ত্বাবধানে তিনি দক্ষতার সাথে শিক্ষকতা করতে থাকেন। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. এর পরামর্শে তিনি সাহারানপুর মাযাহেরে উলূম থেকে কানপুর জামেউল উলূম মাদরাসায় যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি জামেউল উলূমের শায়খুল হাদীসের পদে সমাসীন হন। শায়খুল হাদীছ হিসেবে তিনি অনন্য দক্ষতার সাথে দ্বীনি খিদমাত আঞ্জাম দিতে থাকেন। এরপর তিনি ফতেহপুর ইসলামিয়া মাদরাসা কর্তৃপক্ষের বারংবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে সে মাদরাসায় যোগদান করেন এবং অনন্য সাধারণ দক্ষতার সাথে দ্বীনী খিদমাত আঞ্জাম দেন।

এ মাদরাসায় অধ্যাপনা কালে তিনি ব্যাপক ভিত্তিক দ্বীনি কাজ আরম্ভ করেন। বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মসূচীও গ্রহণ করেন। বিশেষ করে কুরআন মজীদ বিশুদ্ধভাবে তালীম দেয়া এবং সুন্নতের ব্যাপক প্রচার-প্রসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

আশরাফুল মাদারিস প্রতিষ্ঠা:

১৩৬২ হিজরী সনে হযরত আল্লামা শাহ আবরারুল হক্ব হারদূয়ী রহ. আপন পীর ও মুরশিদ হাকীমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ. এর অনুমোদন ও পৃষ্ঠপোষকতায় হারদূয়ীতে আশরাফুল মাদারিস নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমান্বয়ে এ মাদরাসাকেন্দ্রিক ব্যাপক দ্বীনি কর্মসূচী হাতে নেন এবং বাস্তবায়ন করতে থাকেন।

খেলাফত লাভ: হযরত আল্লামা শাহ আবরারুল হক্ব হারদূয়ী রহ. আপন পীর ও মুরশিদ হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. এর কাছ থেকে মাত্র তেইশ বছর বয়সে ১৩৬১ হিজরী সনে খেলাফত লাভ করেন। আপন পীর ও মুরশিদ হযরত থানভী রহ. এর ইন্তিকালের পর তিনি ব্যাপকভাবে দাওয়াতী ও ইসলাহী কার্যক্রম আরম্ভ করেন। হাজার হাজার আলেম ও সাধারণ মুসলমানকে তিনি বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষা প্রদান করেছেন এবং ইসলাহের সবক দিয়েছেন। সুদীর্ঘ ৬০ বছর যাবৎ দেশ বিদেশের হাজার হাজার ওলামায়েকেরাম, শিক্ষিত সমাজ, পেশাজীবি ও সাধারণ মানুষ তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। তাঁর হাতে ইসলাহী শিক্ষা গ্রহণ করে অসংখ্য সাধারণ মানুষ অতীত গোনাহ থেকে তাওবা করে নতুনভাবে জীবন পরিচালনা আরম্ভ করেন। বাংলাদেশেও তাঁর অসংখ্য মুরীদান ও ভক্ত রয়েছেন। ২৮জন বিশিষ্ট মুরিদকে তিনি খেলাফতও প্রদান করেছেন।

ইন্তিকাল :

উপমহাদেশের খ্যাতিমান বুযুর্গ ও পীরে কামেল এবং হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী রহ. এর সর্বশেষ খলীফা মহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব সাহেব বিগত ১৭মে ২০০৫ মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৮টায় ৮৮বছর বয়সে ভারতের উত্তর প্রদেশে হারদূয়ী জেলায় নিজ বাড়ীতে ইন্তিকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন)।

লেখক: শায়খুল হাদীছ জামিআ ইসলামিয়া মাইজদী, নোয়াখালী।

পরিবেশ বিপর্যয়ের মূল কারণ : আমাদের করণীয়

- মাওলানা কাজী ফজলুল করিম

পৃথিবীর সবকিছুই একটি নির্ধারিত নিয়মে চলে। সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুর জন্ম বা সূচনা থেকে মৃত্যু বা পরিসমাপ্তি পর্যন্ত সে তার স্রষ্টার নির্ধারিত নিয়মে বেড়ে ওঠে। গাছ-পালা, তরুলতা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, গ্রহ-নক্ষত্র কোন কিছুই তাদের নির্ধারিত গতি, নির্ধারিত কাজ, নির্ধারিত আচরণ পরিত্যাগ করে না। সৃষ্টি জগতের মাঝে লুকিয়ে আছে স্রষ্টার বহু নিদর্শন। মহান আল্লাহর ঘোষণা– 'নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে, সে নৌকায় যা সমুদ্রে মানুষের জন্য কল্যাণকর বস্তু নিয়ে চলে এবং আসমান থেকে আল্লাহ যে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন অতঃপর তার মাধ্যমে যমিন শুষ্ক হয়ে যাওয়ার পর যমীনকে সজীবতা দান করেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সকল প্রকার বিচরণশীল প্রাণী ও বাতাসের পরিবর্তনে এবং আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে নিয়োজিত মেঘমালায় রয়েছে নিদর্শনসমূহ এমন কওমের জন্য, যারা বিবেকবান।' {সূরা ২ বাকারা, আয়াত-১৬৪}

সৃষ্টি জগতের প্রতিটি সৃষ্টি তাদের নিজস্ব আচরণবিধি সঠিকভাবে পালন করার পাশাপাশি সব সময় যে কাজটি করে থাকে, মুহূর্তের জন্যও যে কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না, তা হল, মহান আল্লাহর তাসবীহ পাঠ। মহান আল্লাহর ঘোষণা– 'আসমানসমূহে এবং যমীনে যা আছে সবই পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহর। যিনি বাদশাহ, মহাপবিত্র, মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' {সূরা ৬২ জুমুআ, আয়াত-১}

মূলত মহান আল্লাহর তাসবীহ পাঠই সৃষ্টি জগতের মূল কাজ। এ কথা আমরা বুঝি বা না বুঝি, স্বীকার করি বা না করি, বাস্তব সত্য এটাই যে, সৃষ্টির সব কিছুই সব সময় আল্লাহর তাসবীহ পাঠে, আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত থাকে। চতুর্দিকে যিকিরের পরিবেশ বিরাজমান। গাছ-পালা, তরুলতা, আকাশ-বাতাস, জড়-জীব সব কিছুই তারা তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে যিকিরে ব্যস্ত। শুধু মানুষ এর ব্যতিক্রম। তাই চতুর্দিকে যিকিরের পরিবেশে একমাত্র মানুষ যখন আল্লাহর যিকির থেকে বিমুখ থাকে, তখন সে তাদের অপছন্দের পাত্র হয়। মানুষ যখন আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয়, তখন তার হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেন– 'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়'।{সূরা ১৩ রা'দ, আয়াত-২৮}

মানুষের হৃদয়ের প্রশান্তি একমাত্র মহান আল্লাহর যিকিরের মাঝেই নিহিত। আর যিকিরসমূহের মধ্যে উত্তম একটি যিকির হল 'পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা'। পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে যিকির বলে 'কুরআন'কেই বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন– 'আমিই যিকির নাযিল করেছি এবং এর সংরক্ষণের দায়িত্বও আমারই।' {সূরা ১৫ হাজার, আয়াত-৯}

মানুষ যখন কুরআনকে ছেড়ে দেবে, তথা আল্লাহর যিকির পরিত্যাগ করবে, তখন মানুষের আশপাশের গাছ-পালা, তরুলতা, তথা পরিবেশ যারা সব সময় যিকিরে ব্যস্ত, তারা মানুষের সাথে বিরূপ আচরণ করতে থাকবে। মহান আল্লাহর ঘোষণা– 'মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে ফাসাদ প্রকাশ পায়। যার ফলে আল্লাহ তাদের কতিপয় কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।' {সূরা ৩০ রূম, আয়াত-৪১}

পরিবেশ মানুষকে বিপর্যস্ত করে না, বরং মানুষই পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে। সহজ কথায়, পরিবেশ মানুষের ক্ষতি করে না, বরং মানুষই পরিবেশের ক্ষতি করে। পরিবেশ বিপর্যয়ের যত কারণ হতে পারে, তন্মধ্যে অন্যতম হল মানুষ কর্তৃক আল্লাহর যিকির থেকে বিমুখতা। এই বিশ্ব প্রকৃতির সব কিছুই টিকে আছে মহান আল্লাহর যিকিরের উপর ভিত্তি করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. ইরশাদ করেন– 'যমিনে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ আল্লাহ যিকির চলতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত আসবে না।' {মুসলিম শরীফ, হাদীস-২১১}

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে, আসমান-যমিনের অস্তিত্বই

নির্ভর করছে মহান আল্লাহর যিকিরের উপর। তাই, মানুষ যত বেশি আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল হবে, তত বেশি আসমান ও যমিনের বরকত কমতে থাকবে, তত বেশি বিশ্ব প্রকৃতি আমাদের বিপক্ষে অবস্থান নেবে। ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প– এসবই আমাদের উপর আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল থাকার কারণে শাস্তি স্বরূপ দেখা দেবে। বুদ্ধিমান তারাই, যারা এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও নানাবিধ গযব যখন নাযিল হত, তখন তারা বলত, এগুলো তো বিশ্ব প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম। আজকের আধুনিক বিশ্বে আমরা ঐ কথাই আরো জোরে সোরে বলছি যে, পরিবেশ বিপর্যয় তো বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল। রাসায়নিক বিক্রিয়া কল-কারখানার ধুয়াঁ ইত্যাদি পরিবেশ বিপর্যয়ের মূল কারণ নয়। বরং আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল থাকাই পরিবেশ বিপর্যয়ের মূল কারণ। যদি রাসায়নিক বিক্রিয়াই পরিবেশ বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ হত, তাহলে পূর্ববর্তী উম্মতের উপর যে বিপর্যয়সমূহ নেমে এসেছিল, তা তো কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ছিল না।

প্রত্যেক ব্যাপারেই দু'টি বিষয় কার্যকারণ হতে পারে। একটি বাহ্যিক, যা চোখে দেখা যায়। আপরটি হল গোপনীয়, যা চোখে দেখা যায় না। বরং অদৃশ্য কার্যকারণে তা ঘটে থাকে। বিশ্ব পরিচালনায় যদি অদৃশ্য কার্যকারণ থাকতে পারে, তাহলে কেন পরিবেশ বিপর্যয়ের পিছনে অদৃশ্য কার্যকারন হতে পারবে না। বরং একজন মুমিনের মূল বিশ্বাসই হল 'অদৃশ্য কার্যকারণের উপর'।

আজকের বিশ্বে পরিবেশ বিপর্যয়ের পেছনে যে সমস্ত কারণ রয়েছে, তার বাহ্যিক কার্যকারণ হিসেবে আমরা অবশ্যই রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দায়ী করতে পারি। তবে, রাসায়নিক বিক্রিয়াই একমাত্র কারণ নয়। বরং আল্লাহর যিকির থেকে, আল্লাহর হুকুম-আহকাম থেকে আমাদের দূরে সরে পড়াটাই মূল কারণ। যার মাঝে রাসায়নিক বিক্রিয়াও একটি কারণ। আজ যদি আমরা মহানবী সা.-এর সুন্নাত মোতাবেক জীবন-যাপন করতাম, যা কি না ইবাদত, তাহলেও পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে আমরা রক্ষা পেতাম।

রাসূল সা. ইরশাদ করেন– 'যে ব্যক্তি কোন গাছ লাগাবে, আর তা থেকে কোন মানুষ, পশু-পাখি, হিংস্র জানোয়ার বা যে কোন প্রাণী তা থেকে কিছু খাবে, তাহলে তার জন্য ইহা সাদকা হিসেবে বিবেচিত হবে।' {মুসনাদে আহমাদ, হাদীস-১৪৬৬৮} গাছ-পালা সব সময় আল্লাহর তাসবীহ পাঠে ব্যস্ত। সে কারণেই সম্ভবত মূসা আ.কে ওহী দেয়া হয়েছিল সিনাই প্রান্তরে তুর পাহাড়ে একটি গাছের নিকট। সমস্ত পাহাড়ও যিকিরে ব্যস্ত। আল্লাহর ভয়ে তারা উপর থেকে ভেঙ্গে পড়ে। আল্লাহর ভয়ে ফেটে গিয়ে প্রবাহিত করে পানি। মহান আল্লাহ বলেন– 'অতঃপর তোমাদের অন্তরসমূহ এর পরে কঠিন হয়ে গেল, যেন তা পাথরের মত কিংবা তার চেয়েও শক্ত। আর নিশ্চয় পাথরের মধ্যে কিছু পাথর এমন আছে, যা থেকে নহর উৎসারিত হয়। আর নিশ্চয় তার মধ্যে কিছু পাথর এমন আছে যা চূর্ণ হয়। ফলে তা থেকে পানি বের হয়। আর নিশ্চয় তার মধ্যে কিছু পাথর এমন আছে যা আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে পড়ে। আর আল্লাহ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে গাফেল নন।' {সূরা ২ বাকারা, আয়াত-৭৪}

পাহাড় কর্তৃক এমন আচরণ মহান আল্লাহর চরম আনুগত্যেরই ঘোষণা দেয়। পাহাড়ের এমন বিনয়ী আচরণের কারনেই সম্ভবত মহানবী সা.কে হেরা নামক পর্বতের গুহায় প্রথম ওহী নাযিল করে নবুওত প্রদান করা হয়েছিল। মানুষ যদি আল্লাহর প্রিয় পাত্র হতে পারে, তাহলে মানুষের চার পাশের পরিবেশও তাকে প্রিয় হিসেবে গ্রহণ করবে। যেমনটি গ্রহণ করেছিল নবী-রাসূলদেরকে। ইবরাহীম আ.-এর নিকট আগুন হয়ে গিয়েছিল শীতল ও আরামদায়ক। সাগর মুসা আ.-এর জন্য হয়ে গিয়েছিল রাস্তা। এসবই প্রমাণ করে যে, মানুষ যখন আল্লাহর প্রিয় হয়, পরিবেশ তখন তার কথা শোনে। এর ব্যতিক্রম যে হয় না, তা কিন্তু নয়। বরং অনেক নবী-রাসূলকে তাদের দুরাচার উম্মত কর্তৃক নৃশংসভাবে হত্যার ইতিহাসও তো রয়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে, প্রকৃতি বা পরিবেশ তো দুরাচার উম্মতের বিপক্ষে গিয়ে নবী-রাসূলদের কোন কাজে এল না! ঠিক এখানেই তো ঈমানের মূল বিষয়টি লুকিয়ে আছে। আর তা হল, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ যা খুশী তাই করতে সক্ষম। আল্লাহ পাক দুরাচার কাফেরদের কৃতকর্মের শাস্তি বিধান করবেন। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্তির বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে তাঁরই উপর নির্ভর করে। তিনি যা খুশী তাই করবেন। এখানে কারো কোন প্রকার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও আশা-নিরাশা কাজ করবে না। আমরা সবাই যে তাঁরই বান্দা। তাঁরই ইচ্ছার অধীন সবাই।

নবী-রাসূল কর্তৃক একমাত্র আল্লাহর জন্য, তাঁর দ্বীনের জন্য শত বাধা-বিপত্তি, জুলুম-নির্যাতন সহ্য করার যে দৃষ্টান্ত তাঁরা দেখিয়ে গেলেন– এই বিষয়টিও তো পরবর্তীদের জন্য শিক্ষনীয় হয়ে থাকতে হবে।

বলছিলাম, আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল হওয়াই পরিবেশ বিপর্যয়ের মূল কারণ। এই পরিবেশ শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশ নয়, বরং প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ সবই বিপর্যয়ের মুখে পতিত হবে, যদি মানুষ আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল হয়। আর যদি মানুষ আল্লাহর যিকিরে তথা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে, রাসূল সা.-এর সুন্নাত মত সমস্ত কাজ আঞ্জাম দেয়, আল্লাহর শোকর আদায় করে, তখন আল্লাহ তার নেয়ামতকে আরো বৃদ্ধি করে দেন। মহান আল্লাহর ঘোষণা– 'আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আযাব বড় কঠিন।' {সূরা ১৪ ইবরাহীম, আয়াত-৭}

পরিবেশ সংরক্ষণে আল্লাহর হুকুম ও মুহাম্মাদ সা.-এর তরীকার বাইরে গিয়ে কখনই আমরা আমাদের পরিবেশকে বিপর্যয় থেকে রা করতে পারব না। বিশ্ব জগতের জন্য যিনি রহমত স্বরূপ তথা হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর আদর্শ পরিত্যাগ করে পরিবেশ বিপর্যয় কখনোই ঠেকানো যাবে না। আমাদের সামগ্রিক জীবনটাকে গড়ে তুলতে হবে মহান আল্লাহর যিকির কেন্দ্রিক। তবেই না গড়ে উঠবে একটি সুন্দর, সুখময় ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ।

লেখক, মুহাদ্দিস, কারবালা মাদরাসা, বগুড়া।
e-mail : kf.karim@yahoo.com

দু'আ

মুফতী আবু মাশহূদ

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি পরম দয়াবান ও মেহেরবান। তাই তিনি রহীম ও রহমান। তাইতো তিনি আরশে আজীমের সম্মুখভাগে অংকিত করে দিয়েছেন এই ঘোষণা :

ان رحمتى سبقت على غضبى

অর্থাৎ আমার দয়া ও রহমত সর্বদা অগ্রগামী আমার গজবের উপর। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, বান্দা তার যাবতীয় প্রয়োজনে মহান প্রভুর কাছেই ভিক্ষা চাইবে। এটিকেই দুআ বলা হয়। দু'আর মাধ্যমে বান্দা তার প্রয়োজন পূরণ করতে চাইলে, মহান দয়াময় প্রভূর রহমতের ঝর্ণাধারার শীতল ছায়াতলে অবস্থান নিতে চাইলে দুআটি হতে হবে পরম একাগ্রতার সহিত। শুধু মুখের চাওয়া নয় শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে মহান প্রভূর দরবারে ভিখারী হিসেবে উপস্থিত করতে হবে। বান্দা তার প্রভূর কাছে দু'আ করতে গিয়ে এক সময় যখন মুখের আওয়াজ বন্ধ হয়ে তার প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাস, প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তার গোটা অস্তিত্ব ভিখারী বনে যাবে তখনই মহান আল্লাহর রহমতের ফল্গুধারা ঐ বান্দার প্রতি বর্ষিত হতে শুরু করে। যেমনটি ঘটেছিল বাদশাহ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের জামানায় এক দৃষ্টিহীন মানুষের ক্ষেত্রে।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ একদিন পবিত্র কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে গেলেন। তখন তিনি দেখতে পান, কা'বা শরীফের পার্শ্বে বসে এক দৃষ্টিহীন বৃদ্ধ ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার আকুতি জানাচেছন অনবরত। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করলেন ওহে বৃদ্ধ! কি করছ? বৃদ্ধ জবাবে বললেন, দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরে এখানে বসে আল্লাহর দরবারে দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য ব্যকুল আকুতি জানিয়ে আসছি। হজ্জাজ হতবাক হয়ে বললেন। বিশ বৎসর! অসম্ভব। আমার আল্লাহ বান্দার আকুতি শুনা মাত্রই রহমতের বর্ষণ করে দেন। নিশ্চয়ই এই বৃদ্ধের চাওয়াতে কোন ত্রুটি আছে। হাজ্জাজ বৃদ্ধকে বললেন, তোমাকে তিন দিনের সময় দিলাম। এরই মধ্যে যদি তোমার দৃষ্টি শক্তি ফিরে না আসে তাহলে তিন দিন পর আমার জল্লাদ এসে তোমার গর্দন উড়িয়ে দিবে। এই ধমক দিয়ে হাজ্জাজ বিদায় হলেন। বৃদ্ধ সাথে সাথে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সিজদাবনত হলেন। এমনকি জীবনাবসানের ভয়ে বৃদ্ধের কলিজা শুকিয়ে যাচ্ছিল। মুখ দিয়ে কিছু বের করার শক্তি হারিয়ে ফেলল। বৃদ্ধের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ শ্বাস প্রশ্বাস আল্লাহর কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে লাগল। আল্লাহর রহমত এই মুহূর্তেই বর্ষিত হল বৃদ্ধের উপর। ফিরে আসল হারিয়ে যাওয়া তাঁর দৃষ্টি শক্তি। তিন দিন পর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ফিরে এসে দেখলেন ঐ বৃদ্ধ হাস্যোজ্জল অবস্থায় তাকিয়ে আছে তার দিকে। হাজ্জাজ বললেন, দেখ শুধু মুখে দুআ সারা জীবন করে গেলেও কাজ হবে না। একাগ্রতার সহিত দুআ করলে মুহূর্তেই আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডার খুলে যাবে, বর্ষিত হবে মহান প্রভূর দয়ার ঝর্ণা ধারা।

কোয়ান্টাম মেথড্

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঃ একটি পর্যালোচনা

মুফতী শরীফুল আজম

মুরাকাবা ইলমে তাসাওউফের একটি প্রসিদ্ধ অধ্যায়। যুগ যুগ ধরে ওলি আউলিয়াদের মাঝে এর চর্চা হয়ে আসছে। মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার ভালবাসা জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি লাভ করাই এর উদ্দেশ্য। সদা এক আল্লাহর স্মরণ অন্তরে থাকলে মানুষের পক্ষে তাঁর নাফরমানী সম্ভব নয়। মুরাকাবার মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাকে দেখছেন এবং আমার সাথে আছেন এই বোধ জাগ্রত করে তোলারই চেষ্টা করা হয়। প্রসিদ্ধ হাদীসে জিব্রাঈলে যাকে 'ইহসান' বলে সঙ্গায়ীত করা হয়েছে। ''তুমি এমন ভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি তাকে দেখছ, আর তুমি তাকে দেখতে না পেলেও তিনি তোমাকে দেখছেন''। মুরাকাবার মাঝে মনকে সকল ধরনের চিন্তা মুক্ত করে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুধু মাত্র একটি বিষয়ে ভাবা হয়। এবং লাগাতার দীর্ঘ সময় ধরে অনবরত কল্পনা করা হয়।

ইসলামের এই মুরাকাবার ন্যায় অন্যান্য ধর্মের সাধকদের মাঝেও আত্মশুদ্ধি লাভের জন্য মন নিয়ন্ত্রনের সাধনা করতে দেখা যায়। হিন্দু যোগীদের যোগ্যধ্যান এবং বৌদ্ধদের বিপাসন ধ্যান এর অন্যতম। তবে মুসলমান সূফী-ওলীদের মুরাকাবা আর অমুসলিমদের ধ্যান বা যোগ সাধনার মাঝে তফাত সাত সমুদ্রের। কারণ প্রত্যেকেই এর রিয়াযত মুজাহাদা বা সাধনা করে থাকে নিজ নিজ ধর্মের আক্বিদা-বিশ্বাস ও রীতিনীতির অনুসরণে। ইসলাম একমাত্র একত্ববাদের ধর্ম, আর বাকী সব বহু ইশ্বরবাদে বিশ্বাসী নাস্তিক যেমন বৌদ্ধ সমাজ। কাজেই ধ্যানের ক্ষেত্রেও এসকল বিশ্বাসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ধ্যান- মুরাকাবার মৌলিক উৎসের মাঝে গবেষণা করে পশ্চিমা চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আবিস্কার করেছেন মন নিয়ন্ত্রনের পদ্ধতি, যার নামকরণ করা হয়েছে 'মেডিটেশন'। তাদের গবেষণায় বের হয়ে এসেছে মন-মস্তিস্কের মাঝে ধ্যানের প্রভাব। তারা দেখতে পেয়েছে যে ধ্যানের মাধ্যমে মানুষের মনে যে বিষয় গেথে দেয়া হয় সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সে অনুসারে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ মনের বিশ্বাস অন্য অঙ্গকে প্রভাবিত করে। রোগ মুক্তি ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে এই ধ্যানের ফরমুলা অনুসরণ করে এক জন রোগীর মনের অবস্থা পরিবর্তন করা গেলে অনেকটা সফলতা পাওয়া যাবে। ৬০/৭০ দশকে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের মাঝে এনিয়ে চলে ব্যাপক গবেষনা। এবং তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মানষিক ও শারীরিক উভয় ধরনের রোগ সারাতে মেডিটেশন কার্যকর ভুমিকা রাখতে পারে। এসকল গবেষণার মাঝে অনেকটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের গবেষক ডা: হার্বার্ট বেনসন। দীর্ঘ গবেষণার পর ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত তার 'রিলাক্সেশন রেসপন্স' গ্রন্থে তিনি লেখেন যে, একাগ্র বিশ্বাস নিয়ে মেডিটেশন বা প্রার্থনা করে কিভাবে অনিদ্রা, সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা এবং ব্যাথা-বেদনায় আক্রান্ত রোগীরা আরোগ্য লাভ করতে পারে। তিনি বলেন, উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কারণে যে রোগ-বালাই হয় প্রচলিত চিকিৎসায় তাতে খুব একটা কাজ হয় না। বরং ৬০- ৯০% নিরাময় হয় রোগীর বিশ্বাসের কারণে। 'আমি সুস্থ হবো' এ বিশ্বাসের ফলে রোগীর দেহের নিউরো-ইমিউনোলজিকেল সিস্টেম নতুন উদ্যমে সক্রিয় হয়ে উঠে, বদলে যায় রোগের কোষগত নেতিবাচক স্মৃতি। এ বিশ্বাসকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'প্লাসিবো ইফেক্ট'। তদ্রূপ ক্যালিফোর্নিয়ার কার্ডিওলজিষ্ট ডা: ডীন অরনিশের গবেষণায় বেরিয়ে আসে হৃদরোগ নিরাময়ে মেডিটেশনের কার্যকারিতা। বাইপাস সার্জারি বা এনজিও প্লাস্টি ছাড়াও হৃদরোগের চিকিৎসা সম্ভব

তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। তিনি সর্বপ্রথম ১৯৭৮ সালে ৪০ জন গুরুতর হৃদরোগীকে এক বছর ধরে মেডিটেশন যোগব্যায়াম ও কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার গ্রহণ করানোর মাধ্যমে হৃদরোগ থেকে মুক্ত করে যুক্তরাষ্ট্রে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। এভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় মেডিটেশন নামক বৈজ্ঞানিক ধ্যান পশ্চিমা সমাজে। টাইম ম্যাগাজিনের আগষ্ট ২০০৩ সংখ্যার 'দি সায়েন্স অফ মেডিটেশন' প্রচ্ছদ নিবন্ধে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের ১ কোটি মানুষ এখন নিয়মিতভাবে মেডিটেশন করছে।

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিরাময়ের জন্যে এই মেডিটেশন চর্চার ব্যাপক প্রচলন ঘটছে। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো বাংলাদেশে প্রচলিত কোয়ান্টামের মেডিটেশন। এখানে নিরাময়ের গন্ডি থেকে বেরিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার কথা বলা হচ্ছে। নিরাময়ের বিশ্বাসের স্থলে প্রবর্তন করা হয়েছে 'মুক্ত বিশ্বাস'। দ্বীন ইসলাম যেভাবে আক্বায়েদ (বিশ্বাস) আ'মাল, মুয়ামালা, মুয়াশারা, ও আখলাক এই পাঁচ ভাগে মানুষকে জীবন বিধান দিয়েছে তদ্রুপ কোয়ান্টাম মেথডের মাধ্যমে বর্ণিত সকল ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র দিকনির্দেশনা দেয়ার চেষ্ট করা হয়েছে। 'সফলতার পঞ্চসূত্র' নামে পাঁচটি মনগড়া বিষয় ঠিক করা হয়েছে সঠিক জীবনদৃষ্টি অর্জনের জন্যে। এই জীবনদৃষ্টি প্রয়োগ করে যে কোন ধর্মের লোক নিজ ধর্মে অবিচল থেকেও সে হতে পারে এক 'অনন্য মানুষ' ইনসানে কামেল। সুখ-শান্তি, সফলতা ও সুস্বাস্থ্য সবই অর্জন সম্ভব এই সূত্র অবলম্বনে।

গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক (আসল নাম জানা নেই) বাংলাদেশের এক জন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী। তিনিই উদ্ভাবন করেছেন 'কোয়ান্টাম মেথড' নামক এই বৈজ্ঞানিক ধ্যান পদ্ধতি। যদিও তিনি ডা: বেনসন বা ডা: ডীন অরনিশের মত চিকিৎসাবিদ নন। কিন্তু তাদেরই বাতলানো বৈজ্ঞানিক ফর্মূলা থেকে সূত্র সংগ্রহ করে নিজের গবেষণালব্দ জোতির্বিদ্যার বিভিন্ন দর্শন যোগকরে আবিস্কার করেছেন এক আলাদিনের চেরাগ মার্কা ধ্যান 'মেডিটেশন'। এতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্মের লোকদের আকৃষ্ট করতে সকল ধর্মের কিছু কিছু আদর্শ বিশ্বাস ও রীতিনীতির মিশ্রণ করা হয়েছে। তাই কোয়ান্টাম মেথড পশ্চিমাদেশে প্রচলিত নিরাময়ের মেডিটেশন পদ্ধতি নয় বরং একটি জীবন ব্যবস্থা ও মতবাদ। যেখানে ধ্যান চর্চার নামে বিজ্ঞান ও সকল ধর্ম-মতবাদের সমন্বয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন দিক নির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ঠিক অনেকটা বাদশাহ আকবরের ভ্রান্ত দ্বীনে এলাহীর মত।

শহীদ আল-বোখারীর এ প্রচেষ্টার সূচনা হয় প্রায় ৩ যুগ আগে ১৯৭৩ সালে তদানীন্তন মাসিক ঢাকা ডাইজেস্টে অতীন্দ্রিয় বিষয়ে লেখালেখির মাধ্যমে। ১৯৭৫ সালে তার এবিষয়ক অনেক লেখা প্রকাশিত হয় সপ্তাহিক বিচিত্রায়। বাংলাদেশের অকাল্ট অনুরাগীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৭৬ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ ফেডারেশন অফ এস্ট্রলজার্স। ১৯৮০ সালে এই যোগধ্যান চর্চা এক নতুন মাত্রা লাভ করে ঢাকার শান্তিনগরে অফিস স্থাপনের মাধ্যমে। এর পর ১৯৮৩ সালে মেডিটেশনকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে 'যোগ মেডিটেশন কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা হয়। যা ১৯৮৬ সালে যোগ ফাউন্ডেশন নামে রূপান্তরিত হয়। ধ্যানের স্তরে পৌঁছার প্রক্রিয়াকে সহজ করার জন্যে চলে গবেষনা। এভাবে কোয়ান্টামের প্রতিটি টেকনিক নিয়ে বৈজ্ঞানিক ভাবে পরিক্ষা নিরীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়। ৯০ দশকের শুরুতে এটি একটি পরীক্ষিত পদ্ধতির রূপ পরিগ্রহ করে। এরপর সাধারণ লোকের মাঝে এর পরিচিতি তুলে ধরার জন্য প্রচেষ্টা শুরু হয়। শহীদ মহাজাতক ১৯৯২ সাল থেকে দৈনিক ইত্তেফাক ও মাসিক উপমা সহ বিভিন্ন পত্রিকায় শিথিলায়ন ও মেডিটেশন সম্পর্কে লেখা শুরু করেন। ১৯৯৩ সাল থেকে মাসিক রহস্য পত্রিকায় দীর্ঘদিন নিয়মিত আত্মনির্মাণ বিভাগে লেখেন। সর্ব সাধারণের জন্য ৪ দিনের মেডিটেশন কোর্স চালু করা হয় সর্ব প্রথম ১৯৯৩ এর ৭ জানুয়ারী হোটেল সোনারগাঁওএ। এর পর দীর্ঘ ১৭ বছরে বর্তমান ৩০০ এর অধিক কোর্স পরিচালনা করেন তিনি নিজেই।

আমাদের দেশের লাখ লাখ লোক এ যাবত তার কাছে কোর্স গ্রহণ করেছে। মূলত বিভিন্ন শারীরিক ও মানষিক সমস্যায় জর্জরীতরাই তার কাছে যায় নিরাময়ের আশায়। কিন্তু নিরাময়ের নামে তাদেরকে দিক্ষা দেয়া হয় নতুন এই মতবাদের। অনেকের কাছে তার কর্মকান্ড ইসলাম বিরোধী মনে হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের এই সন্দেহ দূর করার জন্য সেখানে রয়েছে জ্ঞানপাপী

দরবারী আলেম। যিনি কোয়ান্টামের সকল কুফরী মতবাদকে শরীয়ত সম্মত বলে চালিয়ে দেন। বাদশাহ আকবরের দরবারে যেমনটি করতেন মাও: আবুল ফজল। তবে একোর্সে আগত লোকেরা সবচেয়ে বিব্রতবোধ করেন সব ধর্মের লোককে এক সাথে বাইয়াত করে মুরিদ বানানোর মুহূর্তে। কিন্তু তবুও তাদের মোহ ভাঙ্গেনা ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকায়। আজ মুসলমানদের সব চেয়ে বিপদের কারণ হচ্ছে এই ধর্মীয় অজ্ঞতা। বৈষয়িক জ্ঞানে পান্ডিত্য অর্জনে কমতি নেই, কিন্তু
ইসলামের মৌলিক বিষয়ে তারা
জ্ঞান রাখেনা বা প্রয়োজন মনে করে না।

ইসলাম আর কুফরের মাঝে ব্যবধান হচ্ছে কিছু অক্বিদা-বিশ্বাস ও আমল বা আচার আচরন। আক্বিদা বিশ্বাসে গড়মিল হলেই মানুষ ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায়। কোয়ান্টাম সকল ধর্মের প্রতি উদারতা বা সমন্বয় করতে গিয়ে ইসলামের মৌলিক আক্বিদা বিশ্বাস কে বিসর্জন দিয়েছে অতি কৌশলে, যা সকলের পক্ষে বুঝা সম্ভব হয় না। কোয়ান্টামের জীবনদৃষ্টি অনুসরণ করে ধ্যান চর্চার মাধ্যমে অনেকের উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার যে কথা শুনা যায় তা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু মনে করতে হবে, কোন জিনিস উপকারী হলেই তা বৈধ বা শরীয়ত সম্মত হয় না বরং বৈধতার বিষয়টি কোরআন-হাদীসের বিধি বিধানের উপর নির্ভর করে। জুয়া ও মদের কথাই ধরুন, কোরআন করীমেই এতদুভয়ের উপকারিতার কথা স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু তাই বলে হালাল করা হয়নি। (বাকারা ২৯৯) বুঝা গেল উপকারী হলেই হালাল হয় না। কোয়ান্টামের কার্যক্রম ও মতাদর্শ গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এর অসংখ্য বক্তব্য সরাসরি
কোরআন-হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। এখানে সংক্ষেপে তার কয়েকটি আলোচনা পেশ করা হল।

(ক) কোয়ান্টাম কোর্স করতে প্রথমে একটি প্রত্যয়ন পাঠ করানো হয়। এই প্রত্যয়নই হলো কোয়ান্টামের মূল চালিকা শক্তি। যেখানে বলা হয় "অসীম শক্তির অধিকারী আমার মন, যা চাই তাই পাবো, যা খুশি তাই নেব"। অর্থাৎ কোয়ান্টামের বিশ্বাস হল সকল শক্তির উৎস মানুষের মন। (নাউযুবিল্লাহ) পক্ষান্তরে কোরআন পাকের ঘোষণা অনুযায়ী সকল ক্ষমতা ও শক্তির উৎস মহান রাব্বুল আলামীন। তিনি চাইলে হয়, নতুবা হয় না। মানুষ কোন কিছু আল্লাহর দান ছাড়া অর্জন করতে পারে না। আল্লাহ পাক ছাড়া সব কিছু সসীম, একমাত্র তিনিই অসীম। মনের শক্তিকে অসীম বলা স্পষ্ট ভ্রষ্টতা। পবিত্র কোরআন শরীফে বলা হয়েছে "সবকিছু আল্লাহর মুষ্ঠি বলয়ে"। (সূরা নিসা-১২৬) "তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না। (সূরা আত তাকভীর-২৯) "মানুষ যা চায় তাই কি পায়? অতএব পরবর্তী ও পূর্ববতী সব মঙ্গলই আল্লাহর হাতে। (সূরা আন নজম ২৪-২৫)

(খ) ইসলামের মাঝে একটি ভ্রান্তদল অতিবাহিত হয়েছে যাদের কে ক্বাদরিয়া বলা হতো। এরা তাক্বদীরকে অস্বীকার করত এবং মানুষকে ক্বাদেরে মুতলক্ তথা স্বাধীন ও সর্বশক্তির অধিকারী মনে করত। মানুষের সকল কাজের স্রষ্টা মানুষ নিজেই বলে বিশ্বাস করত। কোয়ান্টামের মুক্ত বিশ্বাসের মাধ্যমেও তাক্বদীর তথা ভাগ্যের লিখনিকে অস্বীকার করা হয়েছে। এবং মানুষকে ভাগ্য বিধাতা বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোয়ান্টামের প্রসিদ্ধ উদাহরণ সার্কাসের হাতির কথাই ধরা যাক। ''জঙ্গল থেকে হস্তি শিশুকে ধরে এনে লোহার ৬ ফুট শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে রাখতে সে বড় হয়েও ৬ ফুট বৃত্তকে তার নিয়তি মনে করে। অথচ এখন সে বড়, তার দেহের প্রচন্ড শক্তি দিয়ে এক ঝটকায় শিকল ভেঙ্গে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু মনোজাগতিক নিয়তির শৃংখল তাকে পরিনত করে অসহায় প্রাণীতে। এমনকি সার্কাসে আগুন লাগলে হাতি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, কিন্তু মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেনা''।

কোয়ান্টামের এই উদাহরণ দ্বারা নিয়তির শৃঙ্খল ভেঙ্গে বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এবং তাক্বদীরকে ভ্রান্তবিশ্বাস ও মনোজাগতিক শৃঙ্খল আখ্যা দেয়া হয়েছে। যা সরাসরি কোরআন হাদীস অস্বীকারের শামীল। ইসলাম বলে তাক্বদীরের ভাল মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। হাদীসে জীবরাঈলে যে সকল বিষয়ে ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে তার অন্যতম হচ্ছে
তাক্বদীর বা ভাগ্যের লেখন। তবে

এর অর্থ এই নয় যে হাত গুটিয়ে বসে থাকা বরং অল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলতে থাকতে হবে এবং সৎপথে থাকার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে। আর বিশ্বাস রাখতে হবে ভাগ্যের লেখনের উপর। ছাহাবায়ে কেরাম নবীজী (সা) কে এব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তবে আমল করে কি হবে? উত্তরে নবীজী (সা:) বলেন, كل ميسر لما خلق له ''প্রত্যেকের জন্য তাই সহজ হয় যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে''। হযরত আলী (রা:)কে কেউ তাক্বদীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে বলেন, এক পা উঠাও, লোকটি উঠালো। এর পর বললেন, অপর পা উঠাও, তখন সে অপারগতা প্রকাশ করল। এটাই হলো তাক্বদীর, মানুষ এক কদম বাড়াতে পারে কিন্তু চুড়ান্ত কিছু করতে পারে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া। সার্কাসের হাতির মত হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার কথাও ইসলাম বলে না, আবার কোয়ান্টামের মত নিয়তির শিকল ভেঙ্গে ফেলার কথাও বলে না। ইসলামের শিক্ষা হল, মানুষ চেষ্টার মালিক আল্লাহ দেবার মালিক। তিনি মঞ্জুর করলে বান্দার চেষ্টা সফল হবে, অন্যথায় হবে না।

কোয়ান্টাম বলে "মানুষ নিজেই পারে নিজের সব কিছু বদলে দিতে। রোগকে সুস্থতায়, অভাবকে প্রাচুর্যে, ব্যর্থতাকে সাফল্যে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা মানুষের মধ্যেই রয়েছে।'' পক্ষান্তরে ইসলাম বলে হায়াত-মউত, সুস্থতা-অসুস্থতা, রিযিক, দৌলত বা মান সম্মান সব কিছুরই মালিক আল্লাহ। এসব বিষয় আল্লাহর ইচ্ছাধীন, মানুষ এতে কোন রদ বদল করার ক্ষমতা রাখেনা। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ''যখন আমি রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন, যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন অতঃপর পুনর্জীবন দান করবেন। (সূরা শুআ'রা- ৮০-৮১) ''তারা কি দেখেনা যে আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং হ্রাস করেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (সূরা রূম- ৩৭) ''তুমি বল আমি আমার নিজের ক্ষতি কিংবা লাভেরও মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন। (সূরা ইউনুস ৪৯) কাজেই মানুষ নিজেই পারে সব কিছু বদলে দিতে, কোয়ান্টামের এমন বিশ্বাস কোরআনের শিক্ষার পরিপন্থী।

(গ) কোয়ান্টামের মতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ইসলাম সকল ধর্মের মূল শিক্ষা এক। কাজেই যে কোন ধর্ম পালনই যথেষ্ট। কোয়ান্টামের দৃষ্টিতে সকল ধর্মই গ্রহণযোগ্য। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস পৃ:৯) পক্ষান্তরে কোরআন পাকের ঘোষণা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম। বাকী সব ধর্ম কুফরী মতবাদ ও ভ্রান্ত। কোরআন পাকে বলা হয়েছে : ''নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য দ্বীন এক মাত্র ইসলাম''। (সূরা আলেইমরান-১৯) ''যে লোক ইসলাম ছাড়া কোন ধর্ম তালাশ করে কস্মিন কালেও তা গ্রহণ করা হবে না। এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (আলেইমরান- ৮৫) তাছাড়া স্রষ্টার সত্ত্বা ও গুনাবলীর সংজ্ঞা প্রত্যেক ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন। খৃষ্টানরা তৃত্ববাদে বিশ্বাসী। তাদের মতে পিতা, পুত্র ও মেরী এই তিন প্রভু মিলে হয় গড। হিন্দুরা ব্রক্ষা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনের সমষ্টি ওঁম এর পূজারী। তাছাড়াও তাদের রয়েছে ৩৩ কোটি দেব-দেবী, এবং তারা ভগবানের জন্ম-মৃত্যু ও জয়-পরাজয়ে বিশ্বাসী। বৌদ্ধ ধর্মে স্রষ্টা বলতে কিছুই নেই, সব কিছু প্রকৃতিগত ভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। আর ইসলাম বলে আল্লাহ এক, অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। অর্থাৎ ইসলাম একমাত্র একত্ববাদের ধর্ম, বাকী সব বহু ইশ্বরবাদ অথবা নাস্তিক্যবাদ। স্রষ্টাকে নিয়েই যেখানে এত মতভেদ সেখানে ধর্মের মূল শিক্ষা বলতে আর কি বাকী থাকে?! তাই কোয়ান্টাম সকল ধর্মের মূল শিক্ষা এক বলে যে মতবাদ প্রকাশ করেছে তা একটি অবাস্তব ও কুফুরী মতবাদ।

(ঘ) ''কোয়ান্টাম প্রত্যেককে উৎসাহিত করে আন্তরিক ভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনে''। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-পৃ: ১৪৩) কোয়ান্টামের এই ঘোষণা বা উৎসাহ প্রদান খোদাদ্রোহীতার শামিল। কেননা আল্লাহ পাক সকল আহলে কিতাব, মুশরিক ও পৌত্তলিকদের কোরআনের মাধ্যমে বার বার ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন এবং নিজেদের কুফুরী ধর্মে অটল থাকার ভয়াবহ পরিনতির কথা বুঝিয়েছেন। এর বিপরীত কোয়ান্টাম প্রত্যেককে নিজ নিজ ধর্ম পালনে উৎসাহ প্রদান

করে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়ে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে: '' আর আহলে কিতাবরা যদি ঈমান আনতো তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো।'' (আলেইমরান -১১০) ''আর যদি আহলে কিতাবরা বিশ্বাস স্থাপন করত এবং খোদাভীতি অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নেয়ামতের উদ্যান সমূহে প্রবিষ্ট করতাম''। (মায়েদা-৬৫) আর ইসলাম গ্রহণ ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে পরিনতি কি হবে তাও বলা হয়েছে: ''যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও তার পরিবর্তে দেয়া হয়, তবুও যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের তওবা কবুল করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। পক্ষান্তরে তাদের কোনই সাহয্যকারী নেই।'' (আলেইমরাম-৯১)

পবিত্র কোরআনের এধরনের স্পষ্ট বক্তব্যের পরে কেউ যদি মানুষকে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম পালনে উৎসাহ প্রদান করে তাহলে তা কিছুতেই মানুষের মঙ্গল কামনা হতে পারে না, বরং তা হবে প্রবৃত্তি পূঁজা ও ধোঁকাবাজী। সব ধর্মের লোককে খুশি করার মাঝে কোয়ান্টামে কি স্বার্থ রয়েছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। এধরনের মতাদর্শের অনুসরণ করে মানুষ দুনিয়াতে কিছু পেলে পেতে পারে তবে পরকালে রিক্তহস্ত হওয়া নিশ্চিত। এখন যদি কেউ পরকালেই বিশ্বাসী না হয় তবে তাকে বুঝানোই বেকার।

(ঙ) কোয়ান্টাম যেহেতু সর্বধর্ম সমন্বয় দর্শনের প্রবক্তা তাই সে সব ধর্মের কিছু কিছু ধর্ম বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছে। যেমন বৌদ্ধ ধর্মে স্রষ্টা নেই তাই মানুষকে কেউ সৃষ্টিও করে নাই, বরং মানুষের জন্ম-মৃত্যু একটি প্রাকৃতিক প্রবাহের মত অনবরত প্রবাহিত হয়ে চলছে। এখানে কেউ কাউকে সৃষ্টি করেনি। বৌদ্ধ ধর্মের বিশ্বাস হচ্ছে মানুষের আদিও নেই অন্তও নেই। (ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্তমতবাদ পৃ: ৬৬০) কোয়ান্টাম বৌদ্ধ ধর্মের এই মতকে গ্রহণ করে নিজেও হুবহু একই মত পোষণ করেছে। কোয়ান্টাম কনিকার ১৫ নং পৃষ্টায় বলা হয়েছে ''আপনি কসমিক ট্রাভেলার-মহাজাগতিক মুসাফির। আপনার জন্ম নেই মৃত্যু নেই।'' জন্ম যদি না থাকে তাহলে জন্মদাতা ছাড়াই মানুষ অস্তিত্ব লাভ করেছে। তার মানে প্রাকৃতিক ভাবেই সব হচ্ছে স্রষ্টা বলতে কিছুই নেই। (নাউযুবিল্লাহ) একই পুস্তকে ২১ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি হয়"। এখানেও প্রকৃতিকে স্রষ্টা মানা হয়েছে, যা বৌদ্ধ ধর্মের বিশ্বাস। অথচ পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে '' আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অত:পর রিযিক দিয়েছেন, এর পর তোমাদের মৃত্যু দিবেন, এর পর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটিও করতে পারে? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও মহান।'' (সূরা রূম -৪০) ''কল্যাণময় তিনি যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন। এবং এতে রেখেছেন সূর্যও দীপ্তিময় চন্দ্র"। (ফোরকান -৬১)

কথা অনেক লম্বা হয়ে গেল তাই আর দীর্ঘ না করে যারা কোয়ান্টাম কোর্স করতে যাচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে দু'একটি কথা বলেই শেষ করছি। শহীদ আল বোখারী এক জন জ্যোতিষী ও স্বঘোষিত সর্বদ্রষ্টা। (নাউযুবিল্লাহ) ইসলামে এধরনের জ্যোতিষ বিদ্যা ও অতীন্দ্রিয় বিদ্যার চর্চা সম্পূর্ণ হারাম করা হয়েছে। কোয়ান্টামের কমান্ড সেন্টার অধ্যায়ে যা কিছু শেখানো হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ঈমান বিধ্বংসী। আপনারা হয়ত জানেন না যে, এধরনের জ্যোতিষীদের কাছে গমন হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী ঈমান বিনাশী। নবীজী (সা:) বলেন ''যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষী বা ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে গমন করল এবং তার কথাকে সত্যায়ন করল সে যেন মোহাম্মদের উপর অবতীর্ণ দ্বীনকে অস্বীকার করল।" অপর হাদীসে বলা হয়েছে, ''যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে কোন বিষয় জানতে চাইল তার ৪০ দিনের নামায কবুল করা হবে না"। (সুনানুল কুবরা- ৮/১৩৮)

অতএব কোয়ান্টামের এসকল ঈমান বিধ্বংসী কর্মকান্ড ও কুফরী মতবাদ থেকে বেঁচে থাকা সকলের কর্তব্য।

লেখক: উস্তাদ, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা।

খানেকাহে এমদাদিয়া
আশরাফিয়া আবরারিয়ার
বার্ষিক ইসলাহী ইজতিমা
১৪,১৫,১৬ জানুয়ারী ২০১৩ইং
সোম, মঙ্গল ও বুধবার
স্থান: জামে মসজিদ, মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

নির্বাচিত ফতওয়া

উচ্চতর ফিকাহ ও ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

☆ **নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পদ কখন কিভাবে বন্টন হবে:**

জিজ্ঞাসা:

জান আলীর ছেলে (১) ফরহাত আলী (২) মুতিউর রহমান (৩) মকবুল আহমদ (৪) মুখলিসুর রহমান। ৪র্থ ছেলে মুখলিসুর রহমান বার্মায় চলে যান। ৬০ বছর ধরে নিখোঁজ। তার বড় তিন ভাই ১৯৪২ সালের মধ্যে সকলেই মারা গেছেন এবং ১৯৬০ এর মধ্যে তার সমবয়সী সকলেই মারা যায়। নিখোঁজ ব্যক্তির কোন সন্তান সন্ততি নেই। তবে তার ভাইদের সন্তান সন্ততি রয়েছে। যদিও বর্তমানে তারা বেশির ভাগ মারা গেছেন। বেঁচে রয়েছেন শুধু সিদ্দিক নামে এক ভাতিজা। এখন আমার প্রশ্ন হলো নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পদের কী হুকুম? কেউ কেউ বলেন তার সমস্ত সম্পদ শুধু জীবিত ভাতিজা সিদ্দিক পাবে। অন্যরা কিছুই পাবে না। একথাটি কতটুকু সত্য?

জবাব:

নিখোঁজ ব্যক্তির সমবয়স্ক লোকদের সকলে মৃত্যু বরণ করলে তখন নিখোঁজকেও মৃত বলে বিবেচনা করাই ইসলামী আইন ও ফরায়িজের একটি নির্ভরযোগ্য বিধান। এর আলোকে নিখোঁজের সমবয়স্কদের মৃত্যুর সময়ের সাথে মিলিয়ে মৃত বলে ঘোষণা দিতে হয়। এই হিসেবে যে সময় থেকে তাকে মৃত বলে বিবেচনা করা হয়, ঐ সময় তার ওয়ারিছ হতে পারে, এই ধরনের লোকদের মধ্যে জীবিত ব্যক্তিদের মাঝে তার সম্পত্তি আল্লাহ পাকের নির্দেশ মতে বন্টন হবে। কোন কারণে সময় মত বন্টনকার্য বাস্তবায়ন না হলেও তা বন্টন হয়ে গেছে বলে মনে করতে হয়। পরবর্তীতে সঠিক বন্টনের সময় সামনে আসলে তখন পূর্বের ঐ কুরআনী বন্টন নীতিকে এর জন্য মূল ও ভিত্তি বানাতে হয়। ঐ সুত্র মতে যারা ওয়ারিছ হতে পারেন তারা না থাকলে তাদের ওয়ারিছদের মধ্যে সম্পদ বন্টন হয়ে চলে আসে। এভাবে যত দিনই ঐ সম্পদের বন্টন বাস্তবায়ন না হোক না কেন শরয়ী বন্টন নিজস্ব গতিতে চলতে থাকে। প্রশ্নের বর্ণনামতে নিখোঁজ মুখলেসুর রহমানকে তার সমবয়স্কদের মৃত্যুর সাথে মিলিয়ে মৃত ধরে নেয়ার পর তার তিন ভাইয়ের যে সকল সন্তান তখন জীবিত ছিল, তারা সকলেই ওয়ারিস বলে বিবেচিত হবে। তবে পুত্র সন্তান থাকা অবস্থায় কন্যা সন্তান ওয়ারিস হয় না, বিধায় তখন কোন কন্যা সন্তান জীবিত থাকলেও তারা সম্পদের ওয়ারিস ও মালিক বলে বিবেচিত হবে না। এই শরয়ী নীতির আলোকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নিখোঁজের ভাইদের সন্তান যারা মারা গিয়েছে তাদের ওয়ারিসরা এই সম্পদের মালিক হবে। আর সিদ্দিকুর রহমান নামে যে ভাতিজা জীবিত আছে সে নিজেই মালিক হবে। তার সন্তানরা নয়। কেননা পিতা জীবিত থাকতে সন্তান ওয়ারিস হয় না।

(দেখুন: আলমগীরি-৬/৪৫১, বাদায়ে উসসানায়ে-৬/১৯৭, আলমগীরী-৬/৪৫৬)

☆ **মিরাছ বন্টনে বিলম্ব করা মারাত্মক গুনাহ এবং মেয়েদের প্রাপ্যের দাবী বন্টনের পূর্বে ছেড়ে দিলে তা কার্যকার হবে না**

জিজ্ঞাসা:

এক ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করার পর ১০/১২ বছর যাবৎ তার মিরাছ সামাজিক রেওয়াজ না থাকায় তাৎক্ষনিকভাবে ওয়ারিসদের মাঝে বন্টন হয়নি। তার ওয়ারিসদের মধ্যে ২জন নাবালেগ ছিলো। তার মৃত্যুর সময় কিছু টাকা ব্যাংকে জমা ছিল এবং কিছু বই ও আসবাব পত্রও ছিল। সেগুলো বিভিন্ন সময়ে বন্টন হয়। যা সংক্ষেপে নিম্নে দেয়া হল। ব্যাংকের টাকা, যা দ্বারা কাফন দাফনের পর কিছু টাকা দোয়া মাহফিলে খরচ হয়। এরপর অবশিষ্ট টাকা মৃত ব্যক্তির স্ত্রী তার দুই এতীম সন্তান ও পরিবারের সবাইকে নিয়ে এক সাথে পরিবারে খরচ করেন। মৃতের কন্যারা ঐ টাকার ভাগ পায়নি। তারা দাবীও করেন নি। এমনিভাবে কিছু বই আসবাবপত্র রেখে যান। যা কেউ কেউ চেয়ে নিয়ে যায়। বাকীগুলো একটি প্রতিষ্ঠানে দান করে দেয়া হয়। আর ঢাকা শহরের বাড়ী ও জমি যার ভাড়ার অর্ধেক মৃতের স্ত্রী নিয়ে সবাই মিলে সংসারে খরচ করত। যার মধ্যে এতীম দুই পুত্র ছিলো কিন্তু ৪ কন্যাকে ঐ বাড়ির ভাড়া দেয়া হয়নি। এবং তারা কোন প্রকার দাবিও করেন নি। বরং এক পরামর্শ সভায় মৃতের স্ত্রী ও কন্যারা তাদের অংশ ছয় পুত্রকে স্বেচ্ছায় দান করার ঘোষণা করে। আর কন্যারা বলে যে, আমরা আমাদের অংশ নিবো না। এরপর ৬ পুত্র উক্ত জমিতে ৪ তালা বিশিষ্ট দালান নির্মান করে। এমনিভাবে গ্রামে জমির অংশ কন্যারা পায়নি। এবং দাবিও করেনি। উল্লেখ্য পুত্ররা কন্যাদেরকে ঢাকা শহরের জমির পরিবর্তে কুমিল্লা শহরের জমি দান করে। বর্তমানে ফরায়েজ সম্পর্কে কিছু বই পত্র পড়ে মৃতের ওয়ারিসদের সন্দেহ হয়েছে যে নিজেদের মধ্যে উপরে বর্ণিত যেভাবে বন্টন করা হয়েছে তাহা শরীয়ত সম্মত হয়েছে কি না। উপরোক্ত বন্টনে কোন ভুল হয়ে থাকলে কিভাবে সংশোধন করতে হবে।

জবাব:

কোন ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলে ইসলামী বিধান অনুযায়ী কাল বিলম্ব না করে প্রথমে তার স্থাবর /অস্থাবর

সম্পদ হতে কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা তার পর ঋণ থাকলে ঋণ পরিশোধ করার পর অসিয়ত করে থাকলে এক তৃতীয়াংশ থেকে অসিয়ত পুরা করার পর অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিসদের মাঝে কুরআন হাদীছ মতে সুষ্টভাবে বন্টন করে দেয়া জরুরী। প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ মতে মায়্যিতের মীরাছ ওয়ারিছদের মাঝে সঠিকভাবে বন্টন হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়নি। বিশেষত: যেহেতু ওয়ারিছদের মধ্যে নাবালেগ ওয়ারিছদের প্রাপ্য অংশ সংরক্ষিত হয়নি এবং মেয়েদের প্রাপ্য অংশ তাদের মালিকানায় আসার পূর্বেই তারা দাবী ছেড়ে দিয়েছে। যা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। অপর দিকে এঘটনা দীর্ঘ দিনের পুরাতন। এমতাবস্থায় সংশোধনের একমাত্র পথ হল যে মৃত ব্যক্তির স্থাবর অস্থাবর সম্পদ হতে যা বর্তমানে মওজুদ আছে সেগুলো ওয়ারিছদের মাঝে শরয়ী পদ্ধতিতে বন্টন করে দিতে হবে এবং অতীতে যা ঘটে গেছ সে গুলোর জন্য একে অপরকে মাফ করে দিতে হবে। কেউ মাফ না করলে যার কারণে এভুল ভ্রান্তি হয়েছে সে দায়ী থাকবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ওয়ারিসদের মধ্য হতে মেয়েদের প্রাপ্য অংশ বন্টন হওয়ার পর মেয়েরা না নিয়ে কাউকে দিয়ে দিতে চাইলে, তা পারবে। বন্টনের পূর্বে শুধু মাত্র দাবী ছেড়ে দিলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে কার্যকর হবে না। (দেখুন: ফতওয়া মাহমুদিয়া-১১/৪০৮, আল আশবাহ-২৩৯)

☆ **জুমআর খুৎবা বাংলায় দিলে জুমআ সহীহ হবে না:**

জিজ্ঞাসা:

জনাব, বাদ তাসলীম আরজ এই যে, আমাদের এলাকায় অবস্থিত বসুন্ধরা কোম্পানীর ফ্যাক্টরীর তত্ত্বাবধানে একটি জামে মসজিদ আছে। উক্ত জামে মসজিদের ইমাম সাহেব বাংলাভাষায় জুমআর খুৎবা দিয়ে থাকেন। শরীয়তের আলোকে বাংলাভাষায় জুমআর খুৎবা দেয়ার হুকুম কী? বিস্তারিত জানিয়ে উপকৃত করবেন বলে আশা করি।

জবাব:

জুমআ ও ঈদের খুৎবা শুধু বক্তৃতা বা ওয়াজ নয়। বরং এটা জুমআ ও ঈদের নামায সঠিক হওয়ার জন্য শর্তও বটে। যেমন ফতওয়ায়ে শামীর ২খন্ড১৪৭নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত (ويشترط لصحتها سبعة اشياء) والرابع (الخطبة فيه) فلو خطب قبله وصلى فيه لم تصح তাই খুৎবার বহুবিধি বিধান হাদীছ এবং ফেক্বাহর কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। কুরআন শরীফে এ খুৎবাকে যিকির বলা হয়েছে। যে রূপ কুরআন শরীফকেও বলা হয়েছে। যেমন তাফসীরে রূহুল মাআনী ১৪তম খন্ডে ২৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত فاسعوا الى ذكر الله والمراد بذكر الله الخطبة والصلاة হুজুর সা. হিজরতের প্রথম বর্ষে মদীনা শরীফে সর্ব প্রথম জুমআর নামায আরম্ভ করেন। যেমন মাআরিফুসসুনান ৪র্থখন্ড ৩০৪পৃষ্ঠায় বর্ণিত:

الجمعة عند الحنفية فرضت بمكة ولم يتمكنوا من ادائها هناك لعدم القدرة والسلطة ثم هاجر ﷺ الى المدينة فوصل الى قبا واقام في بنى عمرو بن عوف اربعة عشر يوما ولم يجمع فيها وذلك لفقد شرط من شرائط وجوب الجمعة وهو المصر ثم لما وصل المدينة جمع هناك

দ্বিতীয় হিজরী সনে রমজানের রোযাও ফরজ হয়েছে। তৎসঙ্গে ঈদের নামাযকেও ওয়াজিব করা হয়েছে। যেমন মাআরিফুস সুনান ৫ম খন্ড ৩২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত। وفرض صوم رمضان لعشر شعبان بسنة ونصف بعد الهجرة তখন থেকে খুৎবা শরীয়তে বিধিবদ্ধ হয়েছে। এ খুৎবা হুজুর সা. শেষ জীবন পর্যন্ত প্রদান করেছেন। তারপর চার খলীফা হযরত আবুবকর রা. হযরত ওমর রা. হযরত ওছমান রা. হযরত আলী রা.সহ সকল সাহাবাগণই খুৎবা প্রদান বা শ্রবন করেছেন। ইসলাম ধর্ম তখন আরব অতিক্রম করে রোম, পারস্যসহ বিভিন্ন অনারব দেশে পৌছে গিয়েছিল। এবং দলে দলে লোক ইসলাম ধর্মগ্রহণ করতে থাকেন। এসব অবস্থায় অনারবদের বিশেষ প্রয়োজন থাকা সত্বেও আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় কোন দিন খুৎবা প্রদান করা হয়নি। সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তীযুগে উলামা, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির এবং কুরআন হাদীছ বিশারদ বড় বড় মনীষী ও বুজুর্গানে দ্বীন একই ধারায় জুমআ ও ঈদের নামাযের খুৎবা আরবীতে প্রদান ও শ্রবন করে আসছেন।

মোট কথা ঐতিহ্যবাহী স্বর্ণযুগ থেকে অদ্যাবধি কোন সাহাবী, ইমাম, আলেম, বুযুর্গ অনারব দেশগুলোতে ইসলাম প্রচার প্রসারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার পরও তাদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় পন্ডিত, সাহিত্যিক ও অভিজ্ঞ লোক থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় জুমআ বা ঈদের খুৎবা প্রদান করার কোন প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় কোথাও পাওয়া যায় নি। এ কারণেই সারা বিশ্বে ১৪০০ বছর পর্যন্ত অনারব দেশেও আরবী খুৎবার প্রচলন রেখেছেন। তদুপরী ঐ যুগের সমস্ত অভিজ্ঞ আলেম একথাও জোরালো ভাবে বলেছেন যে, আরবী ভাষায় খুৎবা না দিলে জুমআর নামায সহীহ হবে না। তাই খুৎবা দিতে পারে মত আরবী শিক্ষা করা ফরজ। যেমন হযরত ইমাম মালেক রহ. যিনি দুই শতাব্দী হিজরীর শেষ দিকের কুরআন হাদীছের বড় অভিজ্ঞ আলেম ছিলেন। এখনও কোটি কোটি মুসলমান তার অনুসারী) তিনি বলেন আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুৎবা দিলে জুমআর নামায সহীহ হবে না। আরবী ভাষায় খুৎবা দেয়ার মত কেহ না থাকলে সে অবস্থায় জুহরের নামায পড়ে নিবে তবুও অন্য ভাষায় খুৎবা দিয়ে জুমআর নামায পড়া জায়েয বা বৈধ হবে না।

হাশিয়াতুদ দাসূকী আলাশ শরহীল

المشارق والمغارب ان فيه كثيرا من الاقاليم كان المخاطبون اعجميين الخ
এবং আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২খন্ড পৃ:২৮৯এ বর্ণিত

وان تكون بالعربية فلا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة عليها بقراءة القرآن فانها لا تجزي بغير العربية وتصح الخطبة لا القراءة بغير العربية مع العجز عنها

তাই বর্তমানযুগে যারা অন্য ভাষায় খুৎবা প্রদান করা জায়েয মনে করে তারা ইসলাম ধর্মকে ইচ্ছানুযায়ী বিকৃত করে তাদের মন মত ও মনগড়া ইসলামকে প্রচার করার ইচ্ছা পোষণ করছে। তাদের এসব নবাবিস্কৃত কর্মকান্ড থেকে মুসলিম উম্মাহর সচেতন থাকা ঈমানী দায়িত্ব বলে মনে করি।

যেমন রাসূল সা. হাদীছ শরীফে ইরশাদ করেন:

فقال العرباضؓ صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم ثم اقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يارسول الله كان هذه موعظة مودع فما ذا تعهد علينا فقال: او صيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه ابو داؤد ২/৬৩৫، والترمذى২/৯৬، بالفاظ متغير وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ হযরত ইরবাজ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, একদিন রসূল সা. আমাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। অত:পর আমাদের দিকে মুখ করে তিনি আমাদেরকে এক মুগ্ধকর উপদেশ প্রদান করলেন। যা শুনে নয়ন হতে অশ্রু প্রবাহিত হল। এবং অন্তরে (আল্লহর) ভয় জেগে উঠল।

১১পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য:

কাবীর ১ম খন্ড ৩৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত:

قوله (وكونها عربية) اى لو كان الجماعة عجميا لا يعرفون العربية فلو كان ليس فيه من يحسن الاتيان بالخطبة عربية لم يلزمه جمعة (حاشية الدسوقي على شرح الكبير)

এবং (শরহে মানহুল জালীল আলা মুখতাসারিল আল্লমা আল খলীল) ১ম খন্ড ২৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত :

وبخطبتين قبل الصلاة وكونهما عربيتين الجهر بهما ولو كان الجماعة عجما لا يعرفون اللغة العربية او..... فان لم يوجد فيهم من يحسنهما عربيتين فلا تجب الجمعة عليهم ولوكان كلهم بكما فلا تجب عليه الجمعة فالقدرة على الخطبتين من شروط وجوب الجمعة.

তেমনি ভাবে তৃতীয় শতাব্দী হিজরী সনের প্রথম দিকের বড় আলেম ইমাম শাফেয়ী রহ. যার অনুসারী এখনও কোটি কোটি মুসলমান। তিনি বলেন আরবী খুৎবা দেয়া জুমআর নামায শুদ্ধ হওয়ার পূর্ব শর্ত। তবে আরবী খুৎবা দেয়ার মত কোন লোক সেই শহরে না থাকলে একমাত্র তখনই নিজভাষায় খুৎবা দিয়ে নামায পড়ে নিবে। সেই মুহূর্ত থেকে ঐ এলাকার ইমামদের আরবী ভাষা শিক্ষা করা ওয়াজিব হয়ে পড়বে। যদি কেউ আরবী শিক্ষা না করে তাহলে সবাই গুনাহগার হবে এবং জুমআর নামায আদায় হবে না। বরং তারা জুমআর পরিবর্তে জুহরের নামায পড়ে নিবে। যেমন নেহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ ২য় খন্ড ৩০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত:

(ويشترط كونها) اى الاركان دون ماعداها (عربية) لاتباعهم ان لم يكن فيهم من يحسنها ولم يكن تعلمها ضيق الوقت خطب منهم واحد بلسان وان امكن تعلمها وجب على كل منهم ولم يتعلموا عصوا كلهم ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر.

অনুরূপভাবে তৃতীয় শতাব্দী হিজরীর প্রথম দিকের অভিজ্ঞ আলেম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. যার অনুসারী অগণিত, অসংখ্য মুসলমান। বর্তমান সৌদি আরবের আলেমগণ তাঁর অনুসারী বলে দাবী করেন। তিনিও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মত আরবী খুৎবার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। যেমন كشف القناع عن متن الاقناع ২/৩৪ গ্রন্থে বর্ণিত:

(ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة) عليها بالعربية (كقراءة) فانها لا تجزئي بغير العربية وتقدم (وتصح) الخطبة بغير العربية مع العجز عنها بالعربية لان المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلوة على رسول الله ﷺ، بخلاف لفظ القرآن فانه دليل النبوة وعلامة الرسالة ولا يحصل بالعجمية (غير القراءة) فلا تجزئ بغير العربية لما تقدم (فان عجز عنها) اى القراءة وجب بدلها ذكر.

সাহাবায়ে কিরামের ছাত্র দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকের অভিজ্ঞ আলেম ইমাম আবুহানীফা রহ. যার অনুসারী ইসলামী জগতে সবচেয়ে বেশি। বিশেষত: বাংলাদেশে যার অনুসারী ৯৯% তিনি বলেন আরবী খুৎবা ছাড়া জুমআর নামায হবে না। যদি আরবী খুৎবা জানার মত কোন লোক না থাকে সে ক্ষেত্রে আরবী শিখা পর্যন্ত অন্য ভাষায় খুৎবা দিয়ে নামায পড়লে নামায আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু রাসূল (সাঃ) এর আদর্শের পরিপন্থী হওয়ার কারণে সে নামায মাকরূহ হবে। যেমন ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া ৯ম খন্ড, ১২৩নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত:

الجواب: السنة المتوارثة فى خطبة الجمعة هى ان يكون بالعربية والخطبة بغير العربية سواء كانت مترجمة بالهندية او بالفارسية او بغيرهما لكونها خلاف السنة بدعة مكروهة قال مولانا ولى الله المحمدث الدهلوىؒ فى المصفى شرح الموطا لما لا حظنا خطب النبى ﷺ وخلفاء ه رضى الله عنهم وهلم جر فنجد فيها وجود اشياء منها الحمد والشهادتين والصلوة على النبى ﷺ والامر بالتقوى وتلاوة آية والدعاء للمسلمين والمسلمات وكون الخطبة عربية الى ان قال واما كونها عربية فلا ستمرار عمل المسلمين فى

মারকাযের ২দিন ব্যাপী বার্ষিক ইসলাহী ইজতিমায় ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান বিশ্ব ইতিহাসে সমাজ সংস্কারে খানকার ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি

বাতিল শক্তি সর্বদা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এর থেকে কখনও তারা ক্ষান্ত ছিল না, বর্তমানেও নেই। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে কিভাবে ধ্বংস করা যায়, কিভাবে সারা দুনিয়ায় ইসলামী আদর্শকে কলোষিত করা যায় এসব অপচেষ্টাতেই যেন তারা দিনাতিপাত করতে থাকে। এই কারণে শুরু থেকে এ পর্যন্ত বহুবিদ ফিতনার সম্মূখীন হতে হয়েছে মুসলমানদেরকে। বিশ্ব ইতিহাসে এমন কোন যুগ পাওয়া যাবে না যে যুগে মুসলমানদেরকে কোন না কোন বাতিল শক্তির মোকাবেলা করতে হয়নি। তবে মুসলমানদের জন্য সবচাইতে সুখকর খবর হলো যখনই কোন বাতিল শক্তি মাথা ছড়া দিয়েছে তখনই এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ করেছে খানকার বাসিন্দারা। তথা বাতিল বিরোধী সংস্কারের প্রায় আওয়াজই খানকার পীর আওলিয়া ও আল্লাহ ওয়ালারাই তুলেছেন। বাদশাহ আকবরের দ্বীনে ইলাহীর বিরুদ্ধে সোচ্ছার হয়ে তাকে অবদমিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন মুজাদ্দিদে আলফেছানী। তিনি ছিলেন খানকার পীর, অলিআল্লাহ। ইংরেজ খেদাও আন্দোলনে সর্বাধিক ভূমিকা যারা রেখেছেন তারাও ছিলেন খানকার পীর। ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ. হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.সহ সকল বড় বড় পীর বুজুর্গ ও আওলিয়ায়ে কিরামই এই আন্দোলনের কীর্তি পুরুষ ছিলেন। ভারতবর্ষে দেবপুজারীদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছেন বড় পীর হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)। সেরূপ এর উপরে গেলেও দেখা যাবে যে কোন সংস্কার আন্দোলনে খানকার ভূমিকাই ছিল সর্বাধিক। খানকার অস্তিত্ব যে দিন থেকে বিলীন হতে আরম্ভ করেছে, সে দিন থেকে বাতিলরা নিজেদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে ব্যাপকভাবেই সফল হচ্ছে। সে কারণে বর্তমানেও যদি খানকার সে ধারাটা পুনরুজ্জীবিত হয়, খানকার যদি নতুন করে প্রাণ সঞ্চলিত হয়, ব্যাপকহারে মুসলমানগণ খানেকাহী জীবন গ্রহণ করে তাযকিয়া, ও নববী আদর্শে জীবন পরিচালনার পথের যাত্রী হয় তবে মনে রাখবেন ইনশাআল্লাহ কোন বাতিল শক্তি তাদের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে না।

গত ২৬, ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১২ ইংতে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামীর জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত ২ দিন ব্যাপী ইসলাহী ইজতিমায় হযরত ওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সালেকীনদের সম্মুখে ইসলাহী বয়ান প্রদান করছিলেন। তিনি বলেন, দেওবন্দীয়ত মানে শুধু মাদরাসা নয়। বরং মাদরাসা যোগ খানেকাহ। দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য শুধু জাহেরী ইলম অর্জন ছিল না। বরং জাহেরী ইলম অর্জনের পাশাপাশি বাতেনী ইলম তথা রূহানী ইলম অর্জন ও তাযকিয়ার পথে ব্যাপক অনুশীলন এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। নবী (সা) এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যাহেরী ইলম ও বাতেনী ইলম উভয়টির সমন্বয় যেখানে ঘটেছে সেখানেই মুসলমানগণ সর্বক্ষেত্রে বিজিত বেশে ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তবয়ে তাবেঈন সকলের মধ্যে এই দুই ইলমের সমন্বয় ছিল। তাই তাদের যুগ ছিল ইসলামের সোনালী যুগ। এর পর ক্রমাগত যে মুসলিম জনপদ শুধু জাহেরী ইলমকেই মূল ইসলামী শিক্ষা হিসেবে ধরে নিয়েছেন এবং বাতেনী ইলমকে দৈনন্দীন জীবন থেকে পরিত্যাগ করেছেন সে জনপদ বিপদগ্রস্থ হয়েছে এবং বিভিন্ন ফিৎনার সম্মূখীন হয়ে পরাজিত হয়েছে। বর্তমানেও যদি মাদরাসা ও খানেকাহ তথা জাহেরী ও বাতেনী ইলমের সমন্বয় ব্যাপকভাবে সৃষ্টি হয় তবে মুসলমানদের শান্তি শৃংখলা ফিরে আসা সময়ের ব্যাপার। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমত আমার শায়খ হযরত হারদুয়ী রহ. এর মাধ্যমে "খানেকাহে এমদাদিয়া আশরাফিয়া আবরারিয়া" নামে এখানে খানেকাহের কাজ আরম্ভ হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে এর শাখা প্রশাখাও প্রতিষ্ঠা হতে চলছে। হযরত হারদুয়ী রহ. এর রূহানী ফয়জ ইনশা আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত এই খানেকাহের প্রতি জারি থাকবে।

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরায় এই ইসলাহী ইজতিমা গত ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১২বৃহস্পতিবার আরম্ভ হয়ে ২৭ফেব্রুয়ারী ২০১২ইং শুক্রবার মাগরিবের সময় হযরত ওয়ালার বিশেষ দুআ ও মুনাযাতের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এই ইজতিমায় সারা দেশ থেকে বিভিন্ন মাদরাসার মুহতামিম, নাযেমে তালীমাত, মুহাদ্দিছ, শিক্ষকপ্রমূখ প্রায় ৭শর বেশি ওলামায়েকেরাম অংশ গ্রহণ করেন। বিশেষ করে হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত দা. বা এর সাথে যারা বাইআতের সম্পর্ক করেছেন এবং তাঁর কাছে যারা ইজাযত প্রাপ্ত হয়েছেন এমন ওলামায়েকেরামের জন্যই প্রতিবছর রবিউল আওয়ালের প্রথম সপ্তাহেই এই ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বিশ্ব বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা মুফতী আবুল কাসেম নূমানী সাহেবের মারকাযে আগমন

গত ৩১ জানুয়ারী ২০১২ইং মঙ্গলবার বিশ্ব বিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দ ভারতের স্বনামধন্য নব নির্বাচিত মুহতামিম হযরত মাওলানা মুফতী আবুল কাসেম নূমানী সাহেব দা. বা. বাংলাদেশে তাঁর প্রথম সফরে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরাতে তাশরীফ আনয়ন করেন। তাঁর আগমনে মারকাযের ছাত্র শিক্ষক বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে রাস্তায় নেমে তাঁকে স্বাগত জানান।

মারকাযের ছাত্র শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, আমাদেরকে আল্লাহ পাক যে দ্বীনি শিক্ষার জন্য কবুল করেছেন এজন্য সবসময় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আবার আপনাদেরকে একারণেও আল্লাহর শুকর আদায় করতে হবে যে, হযরত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেবের ন্যায় শায়খে তরীকত ও বর্ষিয়ান আলেমেদ্বীনের তত্বাবধানে লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি আরো বলেন, যে কোন কাজে আমাদেরকে আকাবিরের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। তবেই আমরা আমাদের মিশনে সফলকাম হতে পারব। তিনি পুরো মুসলিম বিশ্বের শান্তি, ছাত্রদের লেখাপড়ায় দৈনন্দীন তারাক্কী এবং মাদরাসা মসজিদের হিফাজত কামনায় বিশেষ দুআ করেন।

সংগ্রহে :
মাওলানা জসীমুদ্দীন কাসেমী।

মারকাযের খবরাখবর